গণহত্যা ও মুক্তিযুদ্ধ, সংখ্যা ৩, নভেম্বর ২০২১, অগ্রহায়ন ১৪২৮

বাশার খান

একাত্তরের বর্ষাকাল

বাংলাদেশ ছয় ঋতুর দেশ। প্রতি ঋতুই আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য নিয়ে হাজির হয়। এরমধ্যে বর্ষাকাল হলো দ্বিতীয়। গাছের নতুন পাতা, ফুলে ফুলে চারদিক আর পাখির গানসহ নানা কারণে বসন্তকালকে ঋতুরাজ বলা হলেও সৌন্দর্যের জন্য বর্ষাকালকেই অনেকে শ্রেষ্ঠ বলে থাকেন। কারণ গ্রীষ্মের তীব্র তাপদাহ ও রোদে যখন অতীষ্ঠ জনজীবন, তখন বৃষ্টি ও শীতল বাতাস নিয়ে হাজির হয় বর্ষা।

বাংলা বর্ষপঞ্জি অনুসারে আষাঢ়-শ্রাবণ (মধ্য জুন থেকে মধ্য আগস্ট) দুই মাস বর্ষাকাল। তবে বাস্তবে জুন থেকে অক্টোবর পর্যন্ত এর স্থায়িত্ব। বার্ষিক বৃষ্টিপাতের ৮০ শতাংশেরও বেশি হয় এ সময়। গ্রীষ্মের প্রখর উত্তাপে মৃতপ্রায় বৃক্ষরাজি বর্ষার শীতল বৃষ্টিতে নবজীবন ফিরে পায়।[১] এ সময় নদী-নালা খাল-বিল পানিতে থৈ থৈ করে (অবশ্য দখল-দূষণে মৃতপ্রায় অনেক নদী ও খালে বর্ষার এই সৌন্দর্য্য ইদানীং আর দেখা যায় না)।

নানা রূপে ও বৈশিষ্ট্যে বর্ষাকাল অনন্য হলেও এর নেতিবাচক দিক হলো প্রধানত বন্যা। এ সময় অতিবৃষ্টিতে পথঘাট কর্দমাক্ত ও জলাবদ্ধতার কারণে দুর্ভোগে পড়ে মানুষ। বর্ষাকালের এই নেতিবাচক দিক নতুন নয়, বাংলার মধ্যযুগের ইতিহাসেও বর্ষার বিরূপ প্রভাবের বিবরণ পাওয়া যায়। মরক্কোর বিশ্বখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা ১৩৪৬ খ্রিস্টাব্দের বর্ষাকালের দুই মাস (জুলাই-আগস্ট) বাংলায় ভ্রমণে এসেছিলেন। জীবনের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির প্রাচুর্য, জিনিসপত্রের স্বল্পমূল্য, নদী ও তার দুই পাড়ের গ্রাম এবং সর্বোপরি বাংলার নান্দনিক প্রকৃতিতে ইবনে বতুতা আকৃষ্ট হলেও বর্ষাকালীন আবহাওয়া তার পছন্দ হয়নি। বর্ষাকালীন আবহাওয়ার বাস্তবতায় খোরাসানীরা যে বাংলাকে 'দোযখপুর-ই নেয়ামত বা ধনস্পদপূর্ণ প্রাচুর্য' বলে অখ্যায়িত করেছেন সেটি যথার্থ বলে পরে ইবনে বতুতার ভ্রমণকাহিনিতে উল্লেখ করা হয়েছে।[২] বর্ষার ইতিবাচক দিকের সঙ্গে স্বাচ্ছন্দ্য জীবন এবং নেতিবাচক দিকের সঙ্গে খাপ খাইয়েই বাঙালির চিরায়াত জনজীবন। ঝড়, বৃষ্টি-বর্ষা— সবকিছুর সঙ্গেই তাদের নিবিড় সম্পর্ক, বিশেষ করে গ্রামের মানুষের। বর্ষায় বৃষ্টির ঢল বা বন্যায় ঘরে পানি উঠলে তারা মাচা তৈরি করে টিকে থাকার চেষ্টা করে। বাড়িঘর ডুবে গেলে বাধ্য হয়ে অন্যত্র আশ্রয় নেয়। আবার পানি নেমে গেলে নতুন করে ঘর সাজায়। রাতে ঝড়ে বাঁশ, ছন বা টিনের ঘর ক্ষতিগ্রস্ত হলে সকালেই সেটি মেরামত বা ক্ষেত্রবিশেষ নতুন করে নির্মাণ শুরু করে দেয়। বছরের পর বছর ধরে প্রকৃতির বিরূপ আচরণের সঙ্গে এমনইভাবে লড়াই করে টিকে থাকতে বাঙালি অভ্যস্ত।

প্রকৃতির এই বর্ষাকাল স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত পর্ব 'মুক্তিযুদ্ধের' সঙ্গে নানাভাবে সম্পৃক্ত ছিল। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে যে কতগুলো বিষয় সহায়ক অনুষঙ্গ হিসেবে কাজ করেছে, তারমধ্যে অন্যতম হলো বর্ষাকাল। গেরিলা মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়ক শক্তি হিসেবে অনবদ্য ভূমিকা রেখেছে প্রাণপ্রকৃতির এই মৌসুম। কারণ বাঙালিরা হলো 'পানি দেশের মানুষ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানও তাঁর *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*তে এই কথাটি উল্লেখ করেছেন 'পানির দেশের মানুষ আমরা, পানিকে বড় ভালোবাসি।'[৩] যেহেতু মুক্তিযোদ্ধাদের অধিকাংশই ছিলেন গ্রামের কৃষকের ছেলে তাই বর্ষাকাল ছিল তাদের জন্য পানিভাত; পানি ও কর্দময় পথঘাটে যুদ্ধের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করেছিলেন। বর্ষাকালীন গেরিলা হামলায় অসাধারণ দক্ষতা দেখিয়ে পেশাদার পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে তোলতে সক্ষম হয় মুক্তিবাহিনী। অপরদিকে, দখলদার পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী এসেছিল শুষ্ক এলাকা থেকে। বর্ষাকালে বাংলাদেশের নদ-নদী, খাল-বিল ও জলরাশিতে ভেসে থাকা বিস্তীর্ণ অঞ্চলে যুদ্ধ পরিচালনায় অনভিজ্ঞ ছিল তারা। পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী যে পানি ও বৃষ্টিকে ভয় পেত— মুক্তিযোদ্ধাদের সাক্ষাৎকার থেকে এর স্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়। এ কারণে পাকিস্তানি সেনারা বর্ষাকালকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়। মৌসুমটির বাস্তবতা বিবেচনায় উদ্যোগ ও প্রশিক্ষণ পরবর্তী শক্ত প্রস্তুতিও নেওয়া হয়। কিন্তু নদী-খাল-বিল এবং বৃষ্টি-কর্দময় পথঘাটের সঙ্গে বেড়ে ওঠা বাঙালি মুক্তিবাহিনীর আক্রমণের তীব্রতায় পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর এসব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। তাই মুক্তিবাহিনীর জন্য একাত্তরের বর্ষাকাল ছিল অত্যন্ত সহায়ক।

বর্ষাকালে মুক্তিবাহিনীর কৌশল ও প্রস্তুতি

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বর্ষাকালের ভূমিকা ছিল বহুমাত্রিক; অনেকক্ষেত্রে যুদ্ধে গতি-প্রকৃতি নির্ধারণ করেছে এই মৌসুম। যুদ্ধে শত্রুপক্ষের দুর্বলতর পয়েন্টগুলোকে চিহ্নিত করতে পারলে সহজে সফলতা পাওয়া যায়। বিশেষ করে গেরিলা যুদ্ধে এই কৌশল খুবই কার্যকর। মুক্তিবাহিনী এই কৌশলগত পদ্ধতিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বর্ষাকালে পাকিস্তানি সেনাদের দুর্বলতা এবং মুক্তিবাহিনীর কৌশলগত অবস্থান বিষয়ে মুক্তিযোদ্ধা মাহবুব আলমের বিশ্লেষণটি এখানে প্রাসঙ্গিক। তিনি বলেন, '... গেরিলা যুদ্ধে শত্রুর অভ্যাসটা জানা অত্যন্ত জরুরি। ঝড়বাদল বৃষ্টির মধ্যে আমাদের শত্রু অর্থাৎ পাকসেনাদের দল কোনো অবস্থাতেই তাদের শেল্টার ছেড়ে বেরোয় না, বেরুবে না। এটাই তাদের অভ্যাস আর দুর্বলতা। ... কিন্তু ঝড়-বাদল, পানি-কাদায় বেরুতে আমাদের কোনো অসুবিধা নেই।'[৪]

তাই বর্ষাকালকে সামনে রেখে বিশেষ রণকৌশল ও প্রস্তুতি নেয় বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী। বর্ষাকালে মুক্তিবাহিনীর যুদ্ধ কৌশল ও প্রস্তুতি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য পাওয়া যায় শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধা শাফী ইমাম বীর বিক্রমের লেখা চিঠিতে। একাত্তরের ১৬ জুন শহীদ রুমী তাঁর মামা সৈয়দ মোস্তফা কামাল পাশাকে লেখা চিঠির এক জায়গায় উল্লেখ করেন, 'ইতোমধ্যে আমাদের যুদ্ধ অনেক এগিয়ে গেছে। বর্ষা শুরু হলে আমরা আক্রমণের তীব্রতা বাড়িয়ে দেব।'[৫] মার্কিন সাংবাদিক সিডনি শনবার্গ একাত্তরে *নিউইয়র্ক টাইমস*-এর দিল্লী সংবাদদাতা ছিলেন। ২৫ মার্চ রাতে ঢাকায় পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের পর অন্যান্য বিদেশি সাংবাদিকদের সঙ্গে সিডনি শনবার্গকেও জোড়পূর্বক বিমানবন্দরে নিয়ে বাংলাদেশ ত্যাগে বাধ্য করা হয়। পরে তিনি দিল্লীতে থেকে বাংলাদেশে চালানো পৈশাচিক গণহত্যা, মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্ব এবং লাখ লাখ শরণার্থীর দুঃখ-দুর্ভোগের কথা তুলে ধরেছেন বিশ্বের কাছে। যুদ্ধ চলাকালে তিনি একাধিকবার বাংলাদেশেও প্রবেশ করেন এবং রণাঙ্গন থেকে প্রতিবেদন পাঠান। সিডনি শনবার্গের প্রতিদিনেও বর্ষাকালে পাকিস্তানি সেনাদের নাস্তানুবাদ করতে মুক্তিবাহিনীর পরিকল্পনার কথা বেশ গুরুত্ব দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি লেখেন—

... বাঙালিরা নির্ভর করছে বর্ষা মৌসুমের বৃষ্টির ওপর, কয়েক সপ্তাহের মধ্যে যা শুরু হবে। পূর্বপাকিস্তানের গ্রামাঞ্চলের জটিল পথ— গাঙ্গেয় ব্রহ্মপুত্র জলধারা ও সহস্র নদীর আঁকিবুঁকি— পশ্চিম প্রদেশের শুষ্ক ও পার্বত্য অঞ্চল থেকে আগত পাঞ্জাবি ও পাঠানদের কাছে অপরিচিত। বর্ষায় যখন নদী ফুলে ফেঁপে উঠবে এবং মে থেকে অক্টোবর পর্যন্ত বন্যায় পূর্বপাকিস্তানের বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়বে, তখন এ অপরিচিতি আরও বাড়বে।[৬]

সীমান্ত এবং বাংলাদেশের ভেতরে চারদিন সফর করে সিডনি শনবার্গ ওই প্রতিবেদন লিখে পাঠান। প্রতিবেদনের তথ্যসংগ্রহকালে বর্ষায় মুক্তিবাহিনীর প্রস্তুতি বিষয়ে সিডনি শনবার্গ কথা বলেন মুক্তিবাহিনীর এক বাঙালি অফিসারের সঙ্গে। বাঙালি অফিসার জানান, 'আমরা এখন বর্ষার অপেক্ষায় রয়েছি...। তারা (পাকিস্তানি সেনাবাহিনী) পানিকে এত ভয় পায়, আপনি ভাবতেই পারবেন না এবং আমরা হচ্ছি জলের রাজা। তারা তখন (বর্ষাকালে) ভারী কামান ও ট্যাংক নিয়ে চলতে পারবে না, জঙ্গি বিমান উড়তে পারবে না। প্রকৃতি হবে আমাদে দ্বিতীয় বাহিনী।'[৭]

জুলাই-আগস্টে কীভাবে দখলদার বাহিনীকে ব্যতিব্যস্ত ও তাদের ক্ষয়ক্ষতি করা যায় তা নিয়ে সুক্ষ্ম বিশ্লেষণ এবং প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন গেরিলা মুক্তিযোদ্ধারা। অপরদিকে বর্ষাকালে আক্রমণের জন্য মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ ও মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি জেনারেল ওসমানীর একান্ত আগ্রহ ও প্রচেষ্টায় একটি ক্ষুদ্র নৌ-ইউনিট গঠিত হয়। এতে প্রত্যেক্ষ সহযোগিতা করেন ভারতীয় শীর্ষ সামরিক কর্মকর্তা এবং দেশটির নৌবাহিনী। উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য পাকিস্তান নৌবাহিনী ১৫০ জন নৌ-কর্মকর্তা ও নাবিককে ফ্রান্সে পাঠানো হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে সেখান থেকে ৮ জন বাঙালি নাবিক দুঃসাহসিকভাবে পালিয়ে, পাকিস্তানি কূটনৈতিকদের সর্বোচ্চ তৎপরতাকে পরাজিত করে ১০ এপ্রিল ভারতে পৌঁছাতে সক্ষম হন। এই ৮ নাবিককে দিয়েই নৌ কমান্ডো ইউনিট গঠন পরবর্তী প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এরপর মুক্তিবাহিনীর বিভিন্ন প্রশিক্ষণ শিবির থেকে কয়েকপর্বে সুঠামদেহী, ভালো সাঁতার জানা ও চৌকষ বাঙালি যুবকদের বাছাই করা হয়। কঠিন প্রশিক্ষণের অবর্ণনীয় কষ্ট সহ্য ও দক্ষতা বিবেচনায় অনুপোযুক্তদের বাদ দিয়ে ৮ বাঙালি নাবিকসহ নৌকমান্ডোর সংখ্যাটি হয় ৪১৫ জন। এরপর পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার ভাগিরথী নদীর তীরে নৌকমান্ডো প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এটি ছিল 'সুসাইডাল স্কোয়াড'।[৮] মুক্তিবাহিনীর অন্যান্য প্রশিক্ষণ শিবিরের কার্যক্রম ও গেরিলা প্রশিক্ষণ প্রকাশ্যে হলেও নৌকমান্ডো প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় অত্যন্ত গোপনে। এর সাংকেতিক নাম ছিল 'সি-টু-পি'। প্রশিক্ষণে ক্যাম্পের দায়িত্বে ছিলেন ভারতীয় নৌবাহিনীর কর্মকর্তা ও কমান্ডার এস এম সামান্ত। লে. কমান্ডার জি এম মার্টিনসহ ভারতীয় নৌবাহিনীর কর্মকর্তা ও সদস্যরা বাঙালি নৌকমান্ডোদের প্রশিক্ষণ দেন।

ভারত সরকার এবং সামরিক বাহিনীর প্রস্তুতি ও কৌশল

২৫ মার্চ রাতে বাঙালিদের ওপর পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী আক্রমণের পর প্রথম থেকেই ভারত সরকার, বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী এবং ভারতীয় সামরিক বাহিনীর শীর্ষ জেনারেলরা বাংলাদেশের পরিস্থিতির ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। পাকিস্তানি সেনাদের গণহত্যা, কোথাও কোথাও বিদ্রোহী বাঙালি সেনা ও পুলিশের প্রতিরোধ যুদ্ধ, আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতাদের ভারতে আশ্রয় এবং সম্ভাব্য পরবর্তী পরিস্থিতি কী হতে পারে— সবকিছুই গভীর পর্যবেক্ষণে রাখা হয়। পরবর্তী পদক্ষেপগুলিও নেওয়া হয় সতর্কতার সঙ্গে। শুরুতেই অপারেশন সার্চলাইটের মাধ্যমে বাংলাদেশে চালানো গণহত্যার বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাব করেন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। বাংলাদেশে চলমান পরিস্থিতিতে ভারতীয় সহযোগিতার স্পষ্ট ইঙ্গিত দেওয়া হয় ৩১ মার্চ ১৯৭১, ভারতের লোকসভায় উত্থাপিত প্রস্তাবে। সেখানে বলা হয়, 'The house wishes to assure them that, their struggle and sacrifices will receive the whole hearted sympathy and support of the people of India'[৯] এপ্রিল মাসে ভারতে বাংলাদেশী শরণার্থীদের সংখ্যা অস্বাভাবিকহারে বাড়তে থাকে। সমকালীন বাস্তবতা এবং মানবিক দিক বিবেচনায় বাংলাদেশে সংঘটিত ঘটনাবলিকে ভারতের এড়িয়ে যাওয়া বা পিছিয়ে থাকার কোনো পথ ছিল না।

বাংলাদেশে চলমান পরিস্থিতিতে ভারত সরকারের যখন ইতিবাচক এমন অবস্থান, তখন দেশটির সামরিক বাহিনীর অবস্থান ও প্রস্তুতি সম্পর্কেও স্পষ্ট ধারণা প্রয়োজন ছিল প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর। ভারত তখনই সামরিক পদক্ষেপ নেবে নাকি পরিস্থিতি আরও পর্যবেক্ষণ করবে— অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই সিদ্ধান্ত বিষয়ে নানাদিক গভীরভাবে ভাবতে হয়েছে। এই ভাবনা এবং সামরিক দিক বিশ্লেষণে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠে বাংলাদেশের বর্ষাকাল।

বর্ষা মৌসুমে বাংলাদেশের বাস্তবতা ও এর পরিপ্রেক্ষিতে যুদ্ধ বিলম্বিত করা নিয়ে চিন্তা করতে হয়েছে ভারত সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ে। এ নিয়ে আলোচনা হয় ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী ও ভারত সরকারের মন্ত্রিপরিষদ এবং সামরিক বাহিনী প্রধানের সঙ্গেও। ১৯৭১ সালে ভারতের ইস্টার্ন আর্মির প্রধান ছিলেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল জ্যাক জেকব। তাঁর *রোড টু বাংলাদেশ— স্যারেন্ডার অ্যাট ঢাকা* গ্রন্থ থেকে জানা যায়, এপ্রিল মাসের দিকে বন্যার স্রোতের মতই পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরায় বাঙালি শরণার্থীদের অব্যাহত চাপ বাড়তে থাকে। এতে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বিচলিত হন। বাংলাদেশের পরিস্থিতি এবং শরণার্থীদের চাপের বিষয়ে কথা

বলার জন্য সরকারের মন্ত্রিপরিষদ সভায় তৎকালীন ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল স্যাম মানেকশকে ডাকা হয়। বিদ্যমান পরিস্থিতিতে ভারতীয় সামরিক বাহিনী কী ভূমিকা রাখছে— এ নিয়ে জেনারেল মারেকশকে সরাসরি প্রশ্ন করেন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। তখন মানেকশ আপাতত যুদ্ধে সম্পৃক্ত হওয়া ঠিক হবে না— শক্তভাবে এমন মনোভাব প্রকাশ করলে অসন্তুষ্ট হন ইন্দিরা গান্ধী। জেনারেল মানেকশর মন্তব্যে মন্ত্রিসভায় যুক্তিতর্কও হয়, এতে যুক্ত হন পররাষ্ট্রমন্ত্রী সরদার শরণ সিং এবং অর্থমন্ত্রী ওয়াই বি চ্যবন। ভারতীয় সামরিক বাহিনীকে এখনই সরাসরি যুদ্ধে জড়ানো কেন ঠিক হবে না, তার ব্যাখায় মন্ত্রিপরিষদ সভায় জেনালে মানেকশ বলেন—

... এখন এপ্রিল শেষ। ... ১৫-২০ দিন পরেই শুরু হবে বর্ষাকাল। আর পূর্বপাকিস্তানে বৃষ্টির মৌসুমে নদীগুলো সমুদ্রের মত হয়ে যায়— একদিকে পাড়ে দাঁড়ালে অপর পাড় দেখা যায় না। এ রকম পরিস্থিতিতে আমরা রাস্তায় আটকা পড়ে যাবো। পাকিস্তানিরা আমাদেরকে ধুলোয় মিশিয়ে দেবে। এটা গেল একদিক... ।[১০]

এরপর তখনই যুদ্ধে সম্পৃক্ত হওয়ার বিষয়ে মানেকশর অপর নেতিবাচক দিকের ব্যাখায় জানানো হয়, ভারতীয় সামরিক বাহিনী ওই সময় বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে। ভারতজুড়ে তখন ফসল কাটার মৌসুম। ওই মুহূর্তে ভারত যুদ্ধে জড়ালে সামরিক বাহিনীর জন্য প্রতিটি ট্রাক, সড়ক ও রেলপথের প্রয়োজন পড়বে। এমন বাস্তবতায় শস্য পরিবহন সম্ভব হবে না। তাতে ভারতে দুর্ভিক্ষ দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। মানেকশর এই ব্যাখ্যার পর ইন্দিরা গান্ধী চুপ ছিলেন, তবে তাঁর চোখেমুখে ছিল চিন্তার ভাঁজ, যাকে পরে জেনারেল মানেকশ 'রক্তিম মুখমণ্ডল' হিসেবে উল্লেখ করেন। ইন্দিরা গান্ধী এই পরিস্থিতিতে ঐ দিন বিকেল চারটায় আবার মন্ত্রিসভার বৈঠক ডাকেন। সবাই বেরিয়ে গেলে ইন্দিরা গান্ধী মানেকশকে নিয়ে ওয়ান টু ওয়ান আলোচনায় বসেন। সেখানে ব্যক্তিগতভাবে আলাপে মানেকশ ইন্দিরা গান্ধীকে বুঝাতে সক্ষম হন যে, বাংলাদেশের বর্ষাকাল, আরও কিছু বাস্তবতা এবং কৌশলগত কারণে ভারত এপ্রিল মাসেই সরাসরি যুদ্ধে জড়ানো থেকে বিরত থাকা দরকার।[১১]

ভারতীয় সেনাবাহিনীর ইস্টার্ন কমান্ডের চিফ জেনারেল জ্যাকবের দাবি, মন্ত্রিপরিষদের ওই বৈঠকের আগেই এপ্রিল মাসের শুরুতে 'বাংলাদেশের বর্ষাকালীন বাস্তবতা ও পর্যাপ্ত প্রস্তুতির অভাবের বিষয়টি সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল মানেকশকে অবহিত করেন জেকব। এফ জেকব জেনারেল মানেকশকে জানান—

... আমাদের মাউন্টেন ডিভিশনগুলো উপযুক্ত সরঞ্জামে সজ্জিত করে নদীবহুল অঞ্চলে যুদ্ধের জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিতেও বেশ সময় লেগে যাবে। আসন্ন বর্ষাকালে নিমজ্জিত ধানক্ষেতের কারণে সেতুবিহীন নদীগুলো পার হওয়া খুব কঠিন হয়ে যাবে। সে মুহূর্তে রওয়ানা দিলে বড়জোর আমরা পদ্মাপর্যন্ত পৌঁছাতে পারবো। এছাড়া বাংলাদেশের স্বাধীনতার দাবির পক্ষে বিশ্বজনমত তখনও পর্যন্ত সংগঠিত হয়নি। আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমগুলোও পূর্বপাকিস্তানের নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞের ব্যাপারে ততটা ওয়াকিবহাল ছিল না।[১২]

ভারতীয় সামরিক বাহিনী সার্বিক দিক বিবেচনা ও আবহমান বাংলার বর্ষাকালকে সামনে রেখে আলাদা প্রস্তুতি ও রণকৌশল গ্রহণ করেছিল; এমন তথ্য পাওয়া যায় *বিবিসি বাংলা* প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে। প্রতিবেদনে উল্লেখ, ভারতের সামরিক বিশেষজ্ঞ ও মেজর জেনারেল (অব.) দীপঙ্কর ব্যানার্জির ভাষায়, '১৯৬২ সালের পর থেকে বিশেষ করে ইস্টার্ন সেক্টরে ভারতের প্রায় সব সেনাই প্রস্তুতি নিতেন চীনের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য। মাউন্টেন ওয়ারফেয়ার, হাই অল্টিচিউড লড়াইয়ের প্রশিক্ষণ নিতে তারা। অস্ত্রশস্ত্র বা কৌশলও সেভাবেই জোগানো হত। তাই নদীনালায় ভরা বাংলাদেশের জলাময় পরিবেশে যুদ্ধের জন্য তাদেরকে আলাদাভাবে প্রস্তুতি নিতে হয়েছিল।'[১৩]

১৯৭১ সালে লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরাঁ ছিলেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের প্রধান; পরে তিনি বাংলাদেশ-ভারতের সমন্বয়ে গঠিত মিত্রবাহিনীর প্রধান হিসেবে মনোনীত হন এবং যুদ্ধ পরিচালনা করেন। শুভজ্যোতি ঘোষের ওই প্রতিবেদনে আরও জানা যায়, বর্ষাকালের বাস্তবতা বিবেচনায় নিয়েই যুদ্ধটা জুন, থেকে অক্টোবর পর্যন্ত ঠেকিয়ে রাখার পরিকল্পনা নেওয়া হয়, যার তথ্য যৌথবাহিনীর প্রধান জেনারেল অরোরাঁর ভাষ্যেও পাওয়া যায়। ভারতীয় বাহিনীর এই সিদ্ধান্ত যে অত্যন্ত যৌক্তিক ও সময়োপযোগী ছিল তার ব্যাখ্যায় মেজর জেনারেল (অব.) দীপঙ্কর ব্যানার্জি বলেন—

বর্ষাকালে আক্রমণ করাটা মোটেও বুদ্ধিমানের কাজ হত না, কারণ তখন গোটা বাংলাদেশ এক প্রকাণ্ড জলাভূমির চেহারা নেয়। কিন্তু বর্ষার সময়টা পূর্বপাকিস্তানের ভেতরে থাকা বিদ্রোহীরা (মুক্তিবাহিনী) সেখানে পাকিস্তানি ফৌজের যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি করতে পেরেছিল। পুরো বর্ষাটা তাদের ঘিরে রাখা হলো। তারপর যখন বৃষ্টি থামলো তখন চারদিক থেকে তাদের আক্রমণ করা হলো। তারা তেমন প্রতিরোধ গড়তেই পারল না, খুব দ্রুত আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলো।[১৪]

১৯৭১ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর প্রশিক্ষণ শুরু হয় ভারতের ডিমাপুরে। প্রশিক্ষণ পরবর্তী বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অবস্থানের উপর বিমান হামলার তারিখ নির্ধারণ ও তারিখ পরিবর্তনে বিবেচনায় ছিল বর্ষাকাল। বাংলাদেশের নদী ও খালবিল অধ্যুষিত এলাকায় বর্ষাকাল নভেম্বর মাস পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হয়। মুক্তিবাহিনীর বৈমানিকদের দিয়ে প্রথমে ৩ নভেম্বর বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বিমান হামলার তারিখ নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু বর্ষার পানির বিবেচনায় ভারতীয় উর্ধ্বতন সামরিক অফিসারদের নির্দেশে সেটি স্থগিত করা হয়। বাংলাদের ভেতরে বিমান হামলা করা হলে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীও পাল্টা জবাব দিবে, শুরু হতে পারে সর্বাত্মক যুদ্ধ; অপরদিকে বর্ষা দীর্ঘায়িত হওয়ায় বাংলাদেশে সেনা ও ট্যাংক চলাচলে অসুবিধা এবং ভারতীয় বাহিনীর তখন পর্যন্ত অপর্যাপ্ত সমর প্রস্তুতির কারণে মুক্তিবাহিনীর বিমান উইংকে ওই তারিখে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে আক্রমণে নিরুৎসাহিত করা হয়। পরে আক্রমণের তারিখ নির্ধারণ করা হয় ২৮ নভেম্বর, বিশেষ কারণে এই তারিখও পিছিয়ে দিয়ে ৩ ডিসেম্বর নির্ধারণ করা হয়। এদিন পাকিস্তান ভারতের অভ্যন্তরে বিমান হামলা চালানোর কারণে আশ্চর্যজনকভাবে তারিখটি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের আনুষ্ঠানিক যুদ্ধ ঘোষণার দিন হয়ে যায়।[১৫]

ভারতীয় সামরিক বাহিনীকে বাংলার বর্ষাকালকে এতটা গুরুত্ব দিয়েছিল যে, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত ও অন্যান্য মৌসুমে নদ-নদী ও খাল-বিলে কী পরিমাণ পানি থাকে, তাও হিসেবে রাখা হয়। নিখুঁত মানচিত্রে রেল-সড়ক ও নদীপথের সঙ্গে জেলা, মহকুমা ও থানার যোগাযোগ এবং স্থানীয় হাট-বাজার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অবস্থানের ধারণাও অত্যন্ত সুক্ষ্মভাবে অংকন করা হয়। বর্ষার পানি ও অন্যান্য মৌসুমের বাস্তবতার নিরিখে যুদ্ধের কৌশলগত দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা হয়।[১৬]

বর্ষাকে সামনে রেখে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কৌশল ও প্রস্তুতি

দখলদার পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর শুষ্ক এলাকা আগমন করেছে, এটা সত্য। কিন্তু এ জন্য যে তারা বর্ষাকালে হাত গুটিয়ে ছিল বা কোনো পদক্ষেপ নেয়নি, বাস্তবতা এমন ছিল না। তারা বাংলাদেশের বর্ষাকালকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে প্রস্তুতি নেওয়ার দালিলিক তথ্য পাওয়া যায়। এটি তারা দুইভাবে সম্পন্ন করার শেষ চেষ্টা করে।

প্রথমত, বর্ষার আগেই পূর্বপাকিস্তানের সর্বত্র নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা : ২৫ মার্চ আক্রমণে এবং এরপর ঢাকাসহ বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলি দখলে

নেওয়ার চেষ্টা করে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী। কোথাও কোথাও বাঙালি সেনাদের দ্বারা তীব্র প্রতিরোধের মুখোমুখি হলেও তারা অনেকক্ষেত্রে সফলও হয়। কারণ ভারী অস্ত্রসজ্জিত একটি নিয়মিত সামরিক বাহিনীর সঙ্গে লড়াইয়ে, তুলনামূলকভাবে সমরাস্ত্রে দুর্বল বাঙালি বিদ্রোহীদের পক্ষে টিকে থাকা কঠিন ছিল। এরপর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বর্ষার আগেই মহকুমা ও থানাগুলোর নিয়ন্ত্রণের সর্বাত্মক উদ্যোগ নেয়। জুন মাসে দেখা যায়, সর্বাত্মক শক্তিও প্রয়োগ করা হয়। বল প্রয়োগের তীব্রতার একটি উদাহরণ দেওয়া যায় : ১৯৭১ সালের ১৮ জুন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান 'পূর্বপাকিস্তানের সর্বত্র পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণ রয়েছে এবং বাংলার মাটিতে মুক্তিবাহিনীর কোনো অস্তিত্ব নেই' বেতার ভাষণে এমন একটি ঘোষণা দেওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিল। তখন ফেনীর বিলোনিয়ায় অচলাবস্থার কথা জানানো হয় ইয়াহিয়া খানকে। বলা হয়, ঐ এলাকার নিয়ন্ত্রণের আগপর্যন্ত নির্ধারিত ঘোষণাটি যেন না দেওয়া হয়। অন্যথায় কোনো গণমাধ্যম ইয়াহিয়ার ঘোষণাকে চ্যালেঞ্জ করে বসতে পারে। এর পরিপ্রেক্ষিতে ২১ জুনের মধ্যে বিলোনিয়াকে মুক্তিবাহিনী মুক্ত করতে এবং পূর্বপাকিস্তানের অন্যান্য অঞ্চলের দখলদারিত্ব তদারকি করতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর চিফ অব স্টাফ জেনারেল আবদুল হামিদ খানকে পাঠানো হয়। এরপর ফেনী ও বিলোনিয়া অঞ্চল থেকে বাঙালি মুক্তিসেনাদের হটাতে হেলিকপ্টারে দফায় দফায় ছত্রীসেনা নামানো এবং ট্যাংক ও গোলন্দাজ বাহিনীর সমাবেশ করা হয়। পাশাপাশি প্রায় এক ব্রিগেড সেনা এগিয়ে যায়। ট্যাংক ও মুহূরী নদী দিয়ে চালানো গানবোটের সাহায্য নিয়ে মুক্তিবাহিনীর উপর তীব্র আক্রমণ করা হয়। পাকিস্তানি সেনাদের বিশাল আক্রমণের মুখেও শত্রুর সঙ্গে কিছু কিছু জায়গায় মুক্তিবাহিনী প্রতিরোধ করে, খণ্ড খণ্ড যুদ্ধ হয়। একপর্যায়ে মুক্তিযোদ্ধারা ডিফেন্স তুলে সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে চলে যান। অবশ্য এই সাময়িক পরাজয় পরবর্তীতে মুক্তিযোদ্ধারা আরও উদীপ্ত হয়ে, শক্তি বাড়িয়ে পুনরায় পাকিস্তানিদের উপর আক্রমণ করতে অনুপ্রেরণা হিসেবে ভূমিকা রাখে।[১৭]

দ্বিতীয়ত, জলে মুক্তিবাহিনী প্রতিরোধে প্রশিক্ষণ :

মে মাসের ছোটখাটো গেরিলা হামলা এবং জুন মাসে মুক্তিবাহিনীর প্রতিরোধ নিয়ে পাকিস্তানি আর্মির উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে ভাবতে হয়েছিল। বর্ষাকালে যে মুক্তিবাহিনী আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে, এমন বাস্তবতা বিবেচনায় নদীপথে প্রতিরোধ ব্যবস্থা জোরদারে উদ্যোগ নেয় তারা।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, একাত্তরের জুন মাসে তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানে সফরে আসেন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর চিফ অব স্টাফ জেনারেল আবদুল হামিদ খান। এসময় পূর্বপাকিস্তানে নিযুক্ত জেনারেল নিয়াজী এবং উর্ধ্বতন সামরিক অফিসাররা আবদুল হামিদ খানকে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় নিয়ে গিয়ে পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করেন। সফরের অংশ হিসেবে ২৪ জুন ১৯৭১ বৃহস্পতিবার, জেনারেল হামিদ খানকে পূর্বপাকিস্তানের পশ্চিমাঞ্চলে নিয়ে যাওয়া হয়। এদিন হামিদ খান বিমানে প্রথমে যশোরে নামেন। এরপর যশোর, চুয়াডাঙ্গা এবং ফরিদপুরে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী এবং তাদের এদেশীয় সহযোগী রাজাকার ও শান্তি কমিটির কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। ওইদিনকার সফরে আলোচনায় আনা হয় বর্ষাকালকে সামনে রেখে পশ্চিমাঞ্চলে দায়িত্বরত সেনাদের প্রস্তুতির বিষয়টি। এ নিয়ে বার্তা সংস্থা এপিপি'র বরাত দিয়ে প্রকাশিত *দৈনিক ইত্তেফাকে*র প্রতিবেদনে দেখা যায়, বর্ষাকালে নদীপথে মুক্তিবাহিনীর আগমন ও আক্রমণ ঠেকানোর জন্য সেনা ও রাজাকারদেরকে নৌকা ও কলাগাছের ভেলায় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এসময় নদীপথে পাকিস্তানি সেনাদের মহড়ার আয়োজন করা হয় এবং সে মহড়া জেনারেল হামিদ খানকে দেখানো হয়। *ইত্তেফাকে*র প্রতিবেদনে লেখা হয়—

... স্থানীয় কমাণ্ডার জলপথে অনুপ্রবেশের সম্ভাবনা সম্পর্কে জেনারেল হামিদকে জানান যে, নদীপথগুলি কার্যকরভাবে বন্ধ করা হইয়াছে এবং সৈন্যদের প্রয়োজনমত নদীপথে অভিযান পরিচালনার উদ্দেশ্যে ট্রেনিংদান এবং সুসজ্জিত করা হইয়াছে।

জেনারেল হামিদ খান চুয়াডাঙ্গার সৈন্যদের নৌকা, ভেলা এবং অন্যান্য বিশেষ পন্থায় নদীপথ অতিক্রমের মহড়া দেখেন। তিনি সৈন্যদের পুরোপুরি দক্ষতাপূর্ণ এবং বর্ষা মৌসুমে ভ্রাম্যমাণ ও কার্যকরী থাকার পক্ষে পর্যাপ্তভাবে সজ্জিত দেখতে পান।[১৮]

এ নিয়ে *আজাদ* পত্রিকার করা হয় লিড শিরোনাম। 'সেনাবাহিনী_বর্ষা মওসুম মোকাবেলায় প্রস্তুত' শীর্ষক শিরোনামে প্রথম পাতায় ৫ কলাম জুড়ে প্রতিবেদনটি ছাপা হয়। চুয়াডাঙায় জেনারেল হামিদ পাকিস্তানি সেনা ও রাজাকারদের নৌকা-ভেলায় চড়ে আধুনিক পদ্ধতিতে মহড়া পরিদর্শনের কথা উল্লেখ করে প্রতিবেদনটিতে আরও বলা হয়, জেনারেল হামিদ প্রত্যক্ষ করেছেন যে, বর্ষা মৌসুমের জন্য সেনাবাহিনী সম্পূর্ণ প্রস্তুত।[১৯]

পরের দিন ২৫ জুন জেনারেল হামিদ খান পাকিস্তানি নৌ-বাহিনীর ফ্লাগ কমান্ডিংয়ের সদর দফতর পরিদর্শনে যান। সঙ্গে ছিলেন ইস্টার্ন কমান্ডের কমান্ডার লেফটেন্যান্ট জেনারেল এ কে নিয়াজী। এ সময় তাদের পূর্বপাকিস্তান নৌ-বাহিনীর ফ্লাগ অফিসার রিয়াল এডমিরাল এম শরীফ

প্রদত্ত ব্রিফিংয়ে জেনারেল হামিদ খানের কাছে এ অঞ্চলে তাদের নৌ-বাহিনীর কার্যক্রম তুলে ধরা হয়। পরিদর্শনকালে হামিদ খানকে জানানো হয়, পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর অভিযানকে সফর করার জন্য পূর্বপাকিস্তানের নৌ-বাহিনীর সব ঘাঁটি পুনর্গঠন করা হচ্ছে। ফ্লাগ অফিসার কমান্ডিংয়ের সদর দপ্তর পরিদর্শনে শেষ করে হামিদ খান নারায়ণগঞ্জে যান। সেখানে নদীপথে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর চলাচল সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। *ইত্তেফাকের* প্রতিবেদন বলা হয়—

... বর্ষাকালে সেনাবাহিনীর চলাচল নদীপথে চলাচল ব্যবস্থা উন্নত করার জন্য এই ক্যাম্প স্থাপন করা হইয়াছে। জেনারেল (হামিদ খান) এখানকার নৌ-বাহিনীর ইউনিটগুলি পরিদর্শন করেন এবং নৌ-বাহিনীর এখখানি জাহাজে কিছুক্ষণ কাটান।[২০]

বর্ষায় মুক্তিবাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করতে ঢাকার বুড়িগঙ্গা নদীতেও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। পাকিস্তানি সেনা বুড়িগঙ্গা নদীতে মাথা কুচুরিপানা দিয়ে ঢেকে, বিভিন্ন ধরণের কসরত আয়ত্ব করার তথ্য পাওয়া যায় দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ অধ্যাপক সরদার ফজলুল করিমের একাত্তরের দিনলিপিতে। তিনি লেখেন, 'খবর হচ্ছে : খানসেনারা কচুরিপানা মাথায় দিয়ে সদরঘাটে রবার বোটে চরে বর্ষাকালে মুক্তিফৌজের মোকাবেলার কসরত আঁটছে। বর্বরের দল এমন মজার দৃশ্যটা টেলিভিশনের পর্দায় দেখাতেও সঙ্কোচবোধ করেনি।'[২১]

প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতা

একাত্তরের বর্ষাকালে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত গ্রামে মুক্তিযোদ্ধাদের ছোট ছোট ঘাঁটিগুলো নিরাপদ কেন্দ্রে পরিণত হয়। চারদিকে বর্ষার পানি। চরের মাঝখানে কোনো বাড়িতে মুক্তিযোদ্ধারা অবস্থান নিয়ে বিভিন্ন অপারেশন পরিচালনা করেন। চারদিকে পানি থাকায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর এদিকে আসলে সহজেই নজর পড়তো মুক্তিবাহিনীর। অধিকাংশক্ষেত্রে এসব ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থানে পাকিস্তানি সেনা আক্রমণে এগিয়ে যেতে সাহস পেত না। আক্রান্ত হলেও সহজেই প্রতিহত করার সুযোগ ছিল মুক্তিবাহিনীর।

যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা মেজর এম এ ওয়াদুদ ছিলেন খালেদ মোশাররফের অধীনে ২ নং সেক্টরের কে ফোর্সের জোনাল শাখার কমান্ডার। তাঁর দায়িত্বপ্রাপ্ত এলাকা ছিল কুমিল্লার দাউদকান্দি, দাউদকান্দি-গজারিয়া, চাঁদপুরের মতলব উত্তর ও দক্ষিণ থানা এবং এ অঞ্চলের গোমতী-মেঘনা ও ধনাগোদা নদীবাহিত এলাকা। এম ওয়াদুদের নেতৃত্বে ৩ কোম্পানি (প্রায়

১৮০ জন) সেনা ছিলেন। এদের মধ্যে ছিল সেনাবাহিনী, নৌ ও ইপিআরের সদস্য। সাধারণ মুক্তিযোদ্ধাও ছিলেন। হেড কোয়ার্টার স্থাপিত হয় মতলবের সুজাদপুর। সুজাদপুরের চতুর্দিকে নদী। বর্ষা শুরু হলে পানির কারণে এই সুজাদপুর ছিল নিরাপদ। এ জন্য এটিকে জোনাল শাখার হেড কোয়ার্টার করা হয়। সাক্ষাৎকারে মেজর (অব.) ওয়াদুদ বলেন—

আমার জোনাল শাখার হেড কোয়ার্টার এমনতিই চতুর্দিকে নদীবেষ্টিত ছিল। বর্ষাকালে পানি বৃদ্ধি পেলে এই সুজাতপুরের চারপাশে প্রাকৃতিক অ্যাবস্ট্রাকল তৈরি হয়। নদী ও বর্ষাকালের পানির কারণে একমাত্র বিমান হামলা ছাড়া পাকিস্তানি আর্মি আমাদেরকে আক্রমণ করার কোনো পথ ছিল না। অবশ্য বিমান হামলা মোকাবেলার জন্য আমাদের হাতে গান ছিল। তাই, পুরো বর্ষাকালটি ছিল আমাদের জন্য সবচেয়ে নিরাপদ। পাকিস্তানি সেনারা বেশ কয়েকবার নৌপথে এসে আক্রমণ করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে। কারণ আক্রমণে আসার পথগুলোতে আমার অধীন মুক্তিসেনা সবসময় সতর্ক অবস্থানে থাকতো। তারা বড় প্রস্তুতি নিয়ে লঞ্চে করে আক্রমণে এসেও ব্যর্থ হয়েছিল। মুক্তিযোদ্ধারা জলের এসব আক্রমণ সহজেই প্রতিহত করতে সক্ষম হয়। দেখা যায়, তারা আসতো একলঞ্চ ভর্তি, আমাদের কয়েক দল লঞ্চটি গুলি করে ফুটো করে দিলেই কাজ হয়ে যেত। এভাবে নদীতে ডুবে অনেক পাকিস্তানি সেনা ও রাজাকার মারা পড়েছে। এই সুযোগটি নদী ও বর্ষাকালই করে দেয়। আর নৌকা বা স্পিডে আসলে তো একটি-দুটি গুলি করেই কাজ শেষ। নদীতে প্রতি একমাইল দূরত্বে আমার সতর্ক অবস্থান ছিল।[২২]

অপরদিকে, বর্ষাকালীন বৃষ্টিও মুক্তিবাহিনীর জন্য প্রাকৃতিক অ্যাবস্ট্রকল ছিল। কারণ তুমুল বৃষ্টিতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বের হতো না। ক্যাম্প ও তাঁবুতেই থাকতো। বৃষ্টির মধ্যে মুক্তিবাহিনীর ছোট ছোট গেরিলা দল লক্ষ্যস্থলের দিকে এগিয়ে যাওয়া তুলনামূলক নিরাপদ ছিল। ২নং সেক্টরের অধীনে যুদ্ধ করেছেন কুমিল্লার লাঙ্গলকোট উপজেলার রায়কোট গ্রামের মুক্তিযোদ্ধা দেলোয়ার হোসেন মজুমদার। তাঁর সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায়, আগস্ট মাসের কোনো এক রাতে লালমাইয়ে পাকিস্তানি সেনাদের কয়েকটি বাঙ্কারে আক্রমণের জন্য তাদেরকে পাঠানো হয়। এই আক্রমণে গেরিলা দলের কমান্ডার ছিলেন অধ্যক্ষ আবুল কালাম মজুমদার। গেরিলা দলটি মিয়ার বাজার সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কাছে আসার পর তুমুল বৃষ্টি শুরু হয়। বৃষ্টি এত তীব্র ছিল যে, সঙ্গে থাকা স্থানীয় গাইড চলে যায়। তখন সহযোদ্ধাদের কেউ কেউ চিন্তিত হলে কমান্ডার আবুল কালাম মজুমদার অভয় দেন যে, তুমুল বৃষ্টি যেহেতু শুরু হয়েছে, তাহলে তারা এখন

নিরাপদ। কারণ পাকিস্তানি সেনা বৃষ্টিকে ভয় পায়। তাঁবু থেকে বের হবে না। রাতের নীরবতায় পথঘাটও অনেকটা ফাঁকা। প্রকৃতির বৃষ্টি নিরাপত্তা দেয়াল হিসেবে কাজে দিবে। সুতরাং আর গাইডের প্রয়োজন নেই।

গেরিলা দলটি বৃষ্টি মাথায় নিয়ে আট-নয় মাইল হেঁটে নিরাপদভাবেই লক্ষ্যস্থল লালমাইয়ে পৌঁছান। তখন বৃষ্টি কিছুটা কমে আসলেও পাকিস্তানি সেনারা বাঙ্কার থেকে বের হয়নি। রাত ৩.২৬ মিনিটে মুক্তিযোদ্ধারা ফায়ার শুরু করেন। এই আক্রমণে ১২ জন পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়। পাকিস্তানি সেনাদের প্রতিরোধ চেষ্টার গুলিতে মুক্তিযোদ্ধা আলী আশরাফ শহীদ হন। তিনি বিধবা মায়ের একমাত্র সন্তান ছিলেন।[২৩]

মুক্তিবাহিনীর অপারেশন ও সফলতা

বর্ষাকালে মুক্তিবাহিনীর নেতৃত্বে দেশের বিভিন্ন নদ-নদীতে ছোটবড় অনেক গেরিলা অপারেশন পরিচালিত হয়। এসব অপারেশনে বেশিরভাগক্ষেত্রেই মুক্তিবাহিনীর আশানুরূপ সফলতা পাওয়ার তথ্য পাওয়া যায়। ২নং সেক্টরের কমান্ডার খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে তাঁর সেক্টরের বিভিন্ন অঞ্চলে অনেক সম্মুখ যুদ্ধ ও গেরিলা আক্রমণ সংঘটিত হয়। জলের এসব আক্রমণে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ব্যাপক সফলতা পায় মুক্তিবাহিনী। কিছু আক্রমণে শুধু পাকিস্তানি সেনা নিহত ও তাদের অস্ত্র হস্তগত হওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। আক্রমণে বাস্তবতা ও প্রভাবে তারা হতচকিত হয়ে যায়। এমনই একটি দুঃসাহসিক আক্রমণ পরিচালিত হয় নারায়ণগঞ্জে। 'নারায়ণগঞ্জে ৩০০শ স্পিড নির্মাণের গুদামে হামলা' ছিল বর্ষাকালীন ২নং সেক্টরের অধীনে অন্যতম সফল অপারেশন।

'পাক বে' ছিল পাকিস্তানের বিখ্যাত যৌথ নৌযান নির্মাণ কোম্পানি। কোম্পানির নৌযান নির্মাণ কারখানা ছিল নারায়ণগঞ্জে। এই কোম্পানির জলযানের আধিপত্য ছিল পুরো পূর্বপাকিস্তানে। কোম্পানির মালবাহী নৌযান একসময় নারায়ণগঞ্জ থেকে কলকাতা হয়ে আসামের গৌহাটি পর্যন্ত যাতায়াত করতো।[২৪]

একাত্তরের বর্ষায় মুক্তিবাহিনীকে প্রতিরোধ করতে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর এই 'পাক বে' কোম্পানিকে ব্যবহারের উদ্যোগ নেয়। তারা কোম্পানিকে ৩০০ ফাইবার গ্লাস স্পিডবোট তৈরি করে দেওয়ার নির্দেশ দেয়। বিশ্বস্ত সূত্রে এই তথ্য সেক্টর কমান্ডার খালেদ মোশাররফের কাছে পৌঁছায় ঠিক সময়ে। 'পাক বে' কোম্পানিতে কর্মরত এক অফিসারে ভাই খালেদ মোশাররফের অধীনে যুদ্ধরত ছিলেন। তাঁর মাধ্যমেই গুরুত্বপূর্ণ

গোপন সংবাদটি পেতে সক্ষম হন খালেদ মোশাররফ। খালেদ মোশাররফের কাছে সবশেষ খবর পৌঁছায় যে, স্পিডবোটের জন্য ইতোমধ্যে ৩০০ ইঞ্জিনও আনা হয়েছে। বাকি কাজ চলমান। স্পিডবোটগুলো নির্মিত হলে বর্ষায় পাকিস্তানি সেনারা বাংলার প্রত্যন্ত গ্রামেও সহজেই আক্রমণের সক্ষমতা বাড়তো।

এর পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করেন খালেদ মোশাররফ। পাক বে তে কর্মরত অফিসারের ভাইসহ ১০ জন মুক্তিযোদ্ধাকে নিয়ে একটি দল গঠন করেন। এরপর তাদেরকে আলাদাভাবে প্রশিক্ষণ দিয়ে পাঠানো হয় নারায়ণগঞ্জে। দলের কয়েকজন স্পট রেকি করতে আসলে দেখতে পান, ৩০০ ইঞ্জিনের গুদামে মাত্র ২ জন পুলিশ ও ২ জন চৌকিদার পাহারারত। দুর্বল নিরাপত্তার এই সুযোগটি ঐ দিন সন্ধ্যায়ই কাজে লাগান মুক্তিযোদ্ধারা। অপারেশনের শুরুতেই ৪ পাহারাদারকে আত্মসমর্পণ করিয়ে নিরস্ত্র করা হয়। এরপর তাদেরকে একটি রুমে তালাবদ্ধ করে রাখা হয়।[২৫] সফল এই অভিযানের বিবরণে সেক্টর কমান্ডার খালেদ মোশাররফ বলেন,

... গুদামের ভেতরে ডিজেল ও পেট্রোল ছিল। সেগুলো সব মেশিনের ওপর ঢেলে দেয় এবং এরপর তাতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে বেরিয়ে আসে (১০ জনের ঐ দল)। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে সব মেশিন ও ফাইবার গ্লাসের নৌকাগুলোতে আগুন লেগে যায় এবং বিস্ফোরণ ঘটে। এই বিস্ফোরণে সব মেশিন ও ৩০০ নৌকা ধ্বংস হয়ে যায়।[২৬]

সফল এই অপারেশনের ফলে পাকিস্তানি সেনাদের জলের যুদ্ধের প্রস্তুতিতে বড় ধাক্কা লাগে। নদী ও খালে তৎপরতা পরিচালনায় সংকট তৈরি হয়। পানিকে নিরাপত্তা ব্যূহ ধরে মুক্তিবাহিনীর গোপন অবস্থানগুলোও অনেকটা ঝুঁকিমুক্ত হয়।

২নং সেক্টরের অধীন কুমিল্লা-ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার সালদা নদী এলাকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মুক্তিবাহিনীর প্রতিরোধ তীব্রতর হলে সালদা নদীর বিভিন্ন এলাকায় আক্রমণ চালিয়ে মুক্তিবাহিনীর তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। আবার পাকিস্তানি সেনা সেই জায়গা পুনরুদ্ধারে পাল্টা আক্রমণ করে। এভাবেই আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণে ব্যস্ত রণক্ষেত্র ছিল সালদা নদী এলাকা।

জুলাই মাসে পাকিস্তানি সেনা মন্দভাগ ও সালদা নদী এলাকা আবারও দখল করার উদ্যোগ নেয়। সে জন্য পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ৩১ বালুচ রেজিমেন্টকে স্থানীয় কুট্টি নামক স্থানে সমাবেশ করায়। এই রেজিমেন্টকে প্রতিহত করতে সেক্টর কমান্ডার খালেদ মোশাররফ কৌশলগত অবস্থানে তাঁর যোদ্ধাদের মোতায়েন করেন। ৩১ বালুচ রেজিমেন্ট অগ্রসর হওয়ার

পথে তারা প্রথমে মাইনফিল্ডের ভেতরে আটকা পড়ে। এরপরও পাকিস্তানি সেনাদল অগ্রাভিযান অব্যাহত রাখে। তারা যখন মুক্তিবাহিনীর ৫০ গজের মধ্যে চলে আসে তখন ক্যাপ্টেন গাফ্ফারের নেতৃত্বে মুক্তিসেনারা আক্রমণ করে। আক্রমণটি এত তীব্র ছিল যে, একাধিক দিক থেকে চালানো গুলিতে পাকিস্তানি সেনাদের দুটি কোম্পানি শুরুতেই ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। এলোমেলো ছোটাছুটিতে আরও বেশি বিপর্যস্ত হয় তারা। মুক্তিবাহিনীর গুলিতে আহত ও নিহতের সংখ্যা বেড়ে যায়। এর পরিপ্রেক্ষিতে ৩১ বালুচ রেজিমেন্ট তাদের আক্রমণ সাময়িকভাবে বন্ধ করতে বাধ্য হয়। তবে এক ঘণ্টা পর তারা সালদা নদীর দক্ষিণ তীর ঘেঁষে মুক্তিবাহিনীর অবস্থানের ডান পাশ দিয়ে পেছনে আসার চেষ্টা করে। শত্রুসেনা এ পথ দিয়ে আসতে পারে— ক্যাপ্টেন গাফ্ফারের এই ধারণা ও প্রস্তুতি আগে থেকেই ছিল। এ জন্য সুবেদার ওয়াহাবের অধীনে একটি কোম্পানি সালদা নদীর দক্ষিণ তীরে অ্যামবুশ পেতে অপেক্ষমান ছিল। পাকিস্তানি আর্মি এই অ্যামবুশের ফাঁদে পড়ে। তবে তারা পাল্টা আক্রমণেরও চেষ্টা করে। টিকতে না পেরে পিছু হটে। তখন ক্যাপ্টেন গাফ্ফার ও সুবেদার ওয়াহাবের সেনাদল তাদের পিছু ধাওয়া করে। প্রথমে একাধিক দিক থেকে আক্রমণ, পরে অ্যামবুশ এবং পেছনে ধাওয়া— এই তিন পর্বের যুদ্ধে পাকিস্তানি সেনাদের অনেকেই নিহত হয়। আহতের সংখ্যাও কম ছিল না। আশপাশে বর্ষার পানি ও ধানক্ষেত থাকায় পাকিস্তানি সেনাদের বিপর্যস্ত হয় বেশি মাত্রায়। কারণ বর্ষার পানি ও ধানক্ষেত দিয়ে সরে যাওয়াটা তাদের জন্য সহজ ছিল না।[২৭] অপরদিকে, মুক্তিবাহিনীর কাছে পানি ও ধানক্ষেত মাড়িয়ে আক্রমণ করতে তেমন বেগ পেতে হয়নি। কারণ তারা বাংলার জলে রাজা। এ যুদ্ধে পাকিস্তানি সেনাদের হতাহতের বর্ণনায় খালেদ মোশাররফ বলেন—

… এ সময় চারদিকে ধানক্ষেত ও অন্যান্য জায়গায় বেশ পানি ছিল। এসব পানি ভেঙ্গে পশ্চাৎপরসন করার সময় অনেক শত্রু হতাহত হয়। যুদ্ধশেষে সমস্ত যুদ্ধক্ষেত্র খোঁজে আমরা অন্তত ১২০টি মৃতদেহ খুঁজে পাই। আরও মৃতদেহ, যেগুলো পানিতে ছিল, খোঁজে পাওয়া যায়নি। যুদ্ধের ফলাফল আমার জন্য অনেক সুফল বয়ে এনেছিল। আমরা ৮টি মেশিনগান, ১৮টি হাল্কা মেশিনগান, প্রায় দেড়শ রাইফেল, দুটি রকেট লাঞ্চার, দুটি মর্টার ও অজস্র গোলাবারুদ হস্তগত করি।[২৮]

মুক্তিবাহিনীর সদর দপ্তরের প্রেস বিজ্ঞপ্তির সূত্রে ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত *দেশের ডাক* পত্রিকায় ৩০ জুলাই প্রকাশিত প্রতিবেদনে জানায়, ১৫ জুলাই পাকিস্তানি সেনার একটি দল বর্তমান ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার আশুগঞ্জ থেকে

লঞ্চযোগ নরসিংদীর বেলাবো যাচ্ছিল। লঞ্চে প্রায় ১৩৮ জন সেনা ছিল। এ সময় মুক্তিবাহিনীরা লঞ্চটিকে আক্রমণ করে। আক্রমণ এত তীব্র ছিল যে, মাত্র ৪/৫ জন পাকিস্তানি সেনা আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হয়। বাকি সেনা জলের এই আক্রমণে নিহত হয়। মুক্তিবাহিনীর লঞ্চটিকে পুরোপুরি ধ্বংস করে ফেলে।[২৯]

জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহে ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার বাঞ্ছারামপুরে মেঘনা নদীতে এক রাতে একটি সফল অপারেশন করেন ১০ জন মুক্তিযোদ্ধার একটি দল। দলটির কমান্ডার ছিলেন সেনা সদস্য আবদুর রশিদ। এই দলের সহকারী কমান্ডার গাজীপুরের ভুরুলিয়া গ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা হাতেম আলী জানান, একরাতে পাকিস্তানি সেনাদের একটি লঞ্চ বাঞ্ছারামপুর আসার খবর পেয়ে তারা লঞ্চে আক্রমণ করার প্রস্তুতি নেন। নদীর পানিতে নেমে কলাগাছ ধরে ভেসে কচুরিপানা দিয়ে মাথা ঢেকে অগ্রসর হন তাঁরা। রাত ৮টার দিকে গ্রেনেড চার্জ করেন। এতে লঞ্চটিতে আগুন ধরে যায় এবং এক-দেড়শ পাকিস্তানি সেনা মারা যায়। এটাই ছিল ১০ মুক্তিযোদ্ধার ওই দলের প্রথম অপারেশন।[৩০]

১৮ আগস্ট পাকিস্তানি সেনাদের গানবোট শরণখোলা রেঞ্জ পেরোনোর সময় মুক্তিবাহিনীর দ্বারা আক্রমণের শিকার হয়। মুক্তিবাহিনীর ভোলা নদীর দুই তীর থেকে গুলি বর্ষণ করে। এই আক্রমণে পাকিস্তানি সেনাদের ক্ষয়ক্ষতি হয়। একই দিন সুন্দরবন এলাকায় পাকিস্তানি সেনাদের আরেকটি গানবোট মুক্তিবাহিনীর দ্বারা আক্রান্ত হয়। জলের এই দুটি আক্রমণেই পাকিস্তানি সেনারা হতাহত হয়।[৩১]

১৭ আগস্ট ময়মনসিংহের বিদ্যুৎস্টেশন ধ্বংস করতে অপারেশন করেন মুক্তিবাহিনী। অপারেশন শেষে মুক্তিবাহিনীর দলটি নৌকায় করে নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়া পথে গোয়াতলা বাজার সংলগ্ন নদীতে পাকিস্তানি সেনাদের অ্যাম্বুশের কবলে পড়ে। এই অ্যাম্বুশে মুক্তিযোদ্ধাদের অধিকাংশ অস্ত্র নদীতে নিমজ্জিত হয়। অল্পসংখ্যক অস্ত্র গ্রেনেড দিয়ে পাকিস্তানি সেনাদের অগ্রযাত্রা ৫ ঘণ্টা ধরে প্রতিহত করা হয়। এই যুদ্ধে বাঘমারার মুক্তিযোদ্ধা ইদ্রিস আলম শহীদ হন।[৩২]

এছাড়াও সেক্টর কমান্ডার ও মুক্তিযোদ্ধাদের সাক্ষাৎকার এবং সমকালীন সংবাদপত্রের প্রতিবেদনে বর্ষাকালে নদীতে মুক্তিবাহিনীর অসংখ্য গেরিলা আক্রমণ এবং সেগুলোতে পাকিস্তানি সেনার হতাহত, ক্ষয়ক্ষতি এবং তাদের অস্ত্র মুক্তিবাহিনীর হস্তগত হওয়ার তথ্য পাওয়া যায়।

অপারেশন জ্যাকপট

বর্ষাকালে মুক্তিবাহিনীর সফল অপারেশনগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় ছিল ১৫ ও ১৬ আগস্ট পরিচালিত অপারেশন জ্যাকপট। ১৯৭১ সালের ১৫ আগস্ট পরিচালিত হয় মুক্তিযোদ্ধাদের নৌ-কমান্ডো বাহিনীর প্রথম অভিযান 'অপারেশন জ্যাকপট'। এদিন রাতে মুক্তিবাহিনীর নৌ-কমান্ডোদের মধ্যে বাছাইকৃত সদসরা বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে একযোগে মংলা, চট্টগ্রাম, চাঁদপুর, নারায়ণগঞ্জ বন্দর আক্রমণ করেন। এই আক্রমণে পাকিস্তানি বাহিনীর ২৬টি পণ্য ও সমরাস্ত্রবাহী জাহাজ ও গানবোট ডুবিয়ে দেওয়া হয়। অত্যন্ত গোপনে পরিচালিত অপারেশন জ্যাকপটের পর বাংলাদেশের নদী বন্দর ও ফেরিঘাট অনেকটা অকার্যকর হয়ে পড়ে। এর সফলতা তখন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বুকে কাঁপন ধরিয়ে দেয়। বাঙালি নৌ-কমান্ডোরা এই অপারেশনের মাধ্যমে যুদ্ধের গতি সম্পর্কে বিশ্বকে ধারণা দিতে সক্ষম হন।

শুধু কুমিল্লার দাউদকান্দি ফেরিঘাটে অপারেশন পরিচালিত হয়েছিল ১৬ আগস্ট রাতে। নেতৃত্বে ছিলেন সাবেক সচিব শাহজাহান সিদ্দিকী বীরবিক্রম। ১৫ আগস্ট রাতে গোমতী ও মেঘনা নদীতে ঝড়-বৃষ্টির কবলে পড়ে তারা পথ হারিয়ে ফেলেন। তাই ১৬ আগস্ট রাতে অপারেশনটি পরিচালনা করেন এবং ফেরি ও পন্টুন ডুবিয়ে দেন। ১৯৭১ সালের ২০ আগস্ট ত্রিপুরার দৈনিক *সংবাদ* পত্রিকার প্রতিবেদনে জানায়, বিস্ফোরণে পুরো ফেরিঘাট ধ্বংস হয়ে যায়। ফেরিঘাটে টহলদারী ৬ জন রাজাকার ও এক পাকিস্তানি পুলিশ নিহত হয়।[৩৩]

অপারেশন জ্যাকপটে প্রকৃতির বুক পেতে সহায়তা

১৫ আগস্ট রাতে একযোগে এবং ১৬ আগস্ট রাতে পরিচালিত অপারেশনে একটি অবাক করা বিষয় ছিল যে, প্রকৃতি যেন একেবারে বুক পেতে নৌ-কমান্ডোদের সহায়তা করেছে। এর দালিলিক তথ্য পাওয়া যায় ১৬ আগস্ট ১৯৭১, *দৈনিক ইত্তেফাকে* প্রকাশিত খবরে। প্রতিবেদনে বলা হয়, ১৫ আগস্ট ঢাকাসহ সারাদেশে প্রবল বৃষ্টিপাত হয়। এদিন চট্টগ্রামে ৩.৭৪ ইঞ্চি, ফরিদপুরে ২.১২ ইঞ্চি ও মাইজদিকোর্টে ১.৬০ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়। ১৫ আগস্ট সন্ধ্যা ৬টা থেকে পরবর্তী ৩৬ ঘণ্টা সমগ্র পূর্বপাকিস্তানে মাঝারি থেকে ভারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনার কথাও বলা হয়।[৩৪]

বৃষ্টির এই পূর্বাভাস সঠিক ছিল। সাংবাদিক, কলামিস্ট ও লেখক আবু জাফর শামসুদ্দীন তাঁর একাত্তরের দিনলিপিতে উল্লেখ করেছেন যে, ১৫ আগস্ট সারাদিনই বৃষ্টি হয়েছে। একটানা বৃষ্টি হলে সাধারণত মানুষের

মনজগতে প্রভাব পড়ে। বৃষ্টির কারণে মন খারাপ হওয়ার কথাও লিখেছেন আবু জাফর শামসুদ্দীন।[৩৫]

লেখককে প্রদত্ত নৌকমান্ডো শাহজাহান সিদ্দিকী বীরবিক্রমের সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায়, ১৫ আগস্ট রাতে এতবেশি বৃষ্টিপাত হয় যে, তাঁর নেতৃত্বাধীন নৌ-কমান্ডো দল গভীর রাতে অবস্থান নেওয়া ঘাঁটি বন্দরামপুর থেকে (টার্গেট পয়েন্ট থেকে প্রায় দশ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে) নৌকাযোগে রওয়ানা হলে বিশাল গোমতী-মেঘনা সংযোগ এলাকায় প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি ও ঢেউয়ে দিক হারিয়ে ফেলেন। এমতাবস্থায় ভোরের আলোক রাশি দেখা দিতে শুরু করলে অভিযান স্থগিত করে তারা ঘাঁটিতে ফিরে যান। পরের দিন ১৬ আগস্ট রাতে সফল অপারেশন করেন। সে রাতেও গুড়িগুড়ি বৃষ্টি হয়েছিল। ডুবসাঁতার দিয়ে কচুরিপানায় নাক জাগিয়ে নৌ-কমডোরা যখন ফেরি ও পন্টুনের কাছে যেতে থাকেন, পাকিস্তানি প্রহরীরা টেরই পায়নি। বৃষ্টি আর স্রোত থাকায় ঘুরে ঘুরে আসা সার্চলাইটের আলোতেও কচুরিপানার নিচে যে নৌ-কমান্ডো আছে, এটি ন্যূনতম বুঝতে পারেনি প্রহরীরা।[৩৬]

অপারেশন জ্যাকপটে অংশ নেওয়া নৌ কমান্ডোদের অন্যতম দলনেতা ছিলেন আবদুল ওয়াহেদ চৌধুরী বীর উত্তম, বীর বিক্রম (এডব্লিউ চৌধুরী নামেও পরিচিত)। তাঁর নেতৃত্বে সফল আক্রমণ করা হয় চট্টগ্রাম বন্দরে। অপারেশনের রাতে তুমুল বৃষ্টি হওয়ার অনুরূপ বক্তব্য পাওয়া যায় আবদুল ওয়াহেদ চৌধুরীর স্মৃতিচারণে।[৩৭]

প্রবল বৃষ্টির কারণে নদীবন্দর ও ফেরিঘাটে পাকিস্তানিদের প্রহরা কিছুটা হলেও ব্যঘাত হওয়া স্বাভাবিক। অপরদিকে, নৌ-কমান্ডোদেরও বাংলার নদ-নদীতে বর্ষার ঝড়বৃষ্টিতে টার্গেট পয়েন্ট নিখুঁত অপারেশ পরিচালনায় উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ছিল। প্রশিক্ষিত নৌ-কমান্ডোদের দিয়ে নিখুঁত পরিকল্পনা ও দুঃসাহসিক অভিযান এবং প্রকৃতির বুক পেতে দেওয়া সহায়তা— এই দুইয়ে মিলিয়ে পুরো অপারেশন জ্যাকপটে ব্যাপক সফলতা আসে।

মুক্তিবাহিনীর হামলায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিপর্যয় ঢাকার চেষ্টা

বাংলাদেশে স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করছে— মুক্তিযুদ্ধের শুরুতেই বিশ্বকে এমন ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছে পাকিস্তান সরকার। তবে সত্য বেশি সময় আড়ালে থাকেনি। বাংলাদেশে পাকিস্তানি সেনাদের চালানো গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ এবং মুক্তিবাহিনীর দুর্বার প্রতিরোধের কথা দেশি-বিদেশি গণমাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে ধারাবাহিকভাবে। বর্ষাকালে মুক্তিবাহিনীর অব্যাহত গেরিলা আক্রমণে দখলদার পাকিস্তানি বাহিনী বিপর্যস্ত হলেও সেটিও তারা অস্বীকার করার চেষ্টা করেছে।

নিজেদের বিপর্যস্ত হওয়ার কথা আড়াল করার এমনই একটি নমুনা পাওয়া যায় **১৯৭১** সালের **১৭** আগস্ট *দৈনিক ইত্তেফাকে*র প্রথম পাতায় প্রকাশিত প্রতিবেদনে। 'বর্ষাকাল' শব্দটি উল্লেখ করেই প্রতিবেদনটির শিরোনাম করা হয় : 'গেরিলা ও ভারতীয় অনুপ্রবেশকারীদের বর্ষাকালীন পরিকল্পনা নস্যাৎ।' এপিপি সূত্রে প্রকাশিত বিস্তারিত প্রতিবেদনে বলা হয়—

গেরিলা ও ভারতীয় অনুপ্রবেশকারীগণ বর্ষাকালে হামলা চালাইবে বলিয়া এতদিন যে বড়াই করিতেছিল, পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অতি ক্ষিপ্রতাসম্পন্ন সৈনিকগণ তাহা সম্পূর্ণ নস্যাৎ করিয়া দিয়াছে বলিয়া সরকারি রিপোর্টে প্রকাশ। ... আইন ও শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এখন সশস্ত্র বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে আসিয়াছে। রাষ্ট্রবিরোধীগণ যোগাযোগ ব্যবস্থার যে ব্যাপক ক্ষতিসাধন করিয়াছে সশস্ত্র বাহিনী সেগুলো মেরামতের বিরাট কাজ হাতে নিয়াছে।[৩৮]

১৫ ও **১৬** আগস্ট রাতে পরিচালিত অপারেশন জ্যাকপট পরিচালিত হয় অত্যন্ত গোপনে এবং খুবই দক্ষতার সঙ্গে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী প্রতিরোধ করা তো দূরে থাক, আক্রমণের আগমুহূর্তেও তারা টের পাওয়ার তথ্য পাওয়া যায় না। আবার কোনো নৌকমান্ডোও ধরা পড়েনি। অথচ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বর্ষাকালীন পরিকল্পনা নস্যাৎ করে দেওয়া হয়েছে! এই আক্রমণ ভারত করেছে বলেও প্রচার করেছিল পাকিস্তানি প্রশাসন। তাদের ধারণা ছিল যে, এমন নিখুঁত নৌ-আক্রমণ করার সক্ষমতা বাঙালির নেই, এমন আক্রমণ ভারতীয় নৌ-বাহিনী দ্বারাই সম্ভব।

হামলার জন্য ভারতকে দায়ী করা মানে শক্তিশালী নৌ-আক্রমণ হয়েছে- এটা পরোক্ষভাবে স্বীকার করে নেওয়া। এখানে আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় যে, অপারেশন জ্যাকপটের পর পাকিস্তান সরকার ঘোষণা করে, যে কোনো কমান্ডোকে ধরিয়ে দিতে পারলে তাকে দশ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।[৩৯] হামলার জন্য একদিকে ভারতকে দায়ী করা এবং হামলাকারীদের ধরিয়ে দিতে পুরস্কার ঘোষণা; আবার পরিকল্পনা বিনষ্ট করা হয়েছে এমন প্রচার অর্থহীন ও পরস্পর স্ববিরোধী বক্তব্য। বুঝাই যায়, বর্ষাকালের এই হামলার তীব্রতা এত বেশি ছিল যে, এর ক্ষয়ক্ষতিতে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী ও প্রশাসন বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে; পরস্পর স্ববিরোধী বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে যা প্রতীয়মান হয়।

বর্ষায় গেরিলা আক্রমণের প্রভাব এবং প্রতিক্রিয়া

বর্ষাকালে গেরিলা আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর চলাফেরা সীমিত করা হয়। মফস্বলে অবস্থা এমন হয় যে, রাতে ক্যাম্প থেকে বের হওয়া বন্ধ করে দেয়। গ্রামের স্কুলে স্থাপন করা ছোট ছোট সাব-ক্যাম্পগুলো গুটিয়ে

থানা সদরে স্থানান্তরিত করা হয়। বাংলাদেশে বিভিন্ন জায়গায় গেরিলা আক্রমণে পাকিস্তানি সৈন্যের বিপর্যয় ও ক্ষয়ক্ষতি মে-জুন মাসের তুলনায় জুলাই-আগস্টে এসে অনেক বেড়ে যায়। প্রতিদিনই দেখা যায়, পাকিস্তানি আর্মি দেশের কোনো না কোনো নদী অথবা বর্ষায় প্লাবিত অঞ্চলে মুক্তিবাহিনীর আক্রমণের শিকার হচ্ছে। এসব আক্রমণে নৌকা বা গানবোটে থাকা পাকিস্তানি সেনা কোথাও সবাই নিহত হয়। কিছু জায়গায় সাঁতরে ও পেছনে থাকা অপর গানবোটের সহায়তায় প্রাণে বাঁচতে সক্ষম হয়, তবে এমন ঘটনা সংখ্যায় খুবই কম ছিল।

মুক্তিবাহিনী পরিচালিত তীব্র অ্যামবুশগুলোর বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পাকিস্তানি সৈন্য গুলিতে ও পানিতে ডুবে মারা যায়। তাদের বহনকারী অনেক নৌকা বা ছোট লঞ্চ পানিতে ডুবে যায়। অ্যামবুশে আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত নৌকা, গানবোট ও লঞ্চে থাকা পাকিস্তানি সেনাদের সমরাস্ত্র মুক্তিবাহিনীর হস্তগত হয়। ফলে মুক্তিবাহিনীর একদিকে যেমন অস্ত্রের দিক থেকে সমৃদ্ধ হয়, অপরদিকে মানসিক শক্তি ও আত্মবিশ্বাসও বাড়ে। দেখা যায়, একটি গেরিলা আক্রমণের সফলতার পর আরও উদ্যম ও আত্মবিশ্বাস নিয়ে তুলনামূলক বেশি চ্যালেঞ্জিং অপারেশন এগিয়ে যায় সেই দলটি।

এদিকে জুলাই-আগস্টের আক্রমণে পাকিস্তানি সেনা নিহত ও নিখোঁজের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় পুরো বাহিনীতেই মনোবল সংকট দেখা দেয়। এটি সাইকোলজিক্যাল ওয়ারের দৃষ্টিকোণ থেকে পড়া বিপর্যয়। বর্ষাকালে প্রত্যন্ত এলাকায় আহত পাকিস্তানি সেনাকে তাৎক্ষণিকভাবে সরিয়ে নেওয়া অথবা ফিল্ডট্রিটমেন্টের ব্যবস্থা ছিল না। তখন বাংলাদেশের জেলা ও মহকুমার সড়কগুলোর অধিকাংশ সেতু ও কালবার্ট গেরিলাযোদ্ধাদের অপারেশনে ভাঙ্গা ছিল। যোগাযোগ ব্যবস্থা তখন বিধ্বস্ত। এমন বাস্তবতায় আহত সেনাকে সরিয়ে হাসপাতালে নিতে হলে হেলিকপ্টার ছাড়া বিকল্প ছিল না। আহত পাকিস্তানি সেনাকে সীমান্তে, অন্য কোনো ঘটনাস্থলে পড়ে থাকতে হয়েছে দীর্ঘসময়।

১ আগস্ট **১৯৭১**, লন্ডনের টাইমস পত্রিকায় এক পৃষ্ঠা জুড়ে মুরে সেলের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। মুরে সেলের প্রবন্ধটির বরাদ দিয়ে ৭ আগস্ট ত্রিপুরার *দৈনিক সংবাদে* পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনে জুলাই-আগস্টে পাকিস্তানি আহত সেনার সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার একটি চিত্র পাওয়া যায়। প্রবন্ধে মিস্টার সেল তুলে ধরেন—

পাকিস্তান আন্তর্জাতিক বিমান সংস্থার বোয়িং ৭০৭ বিমানগুলি... করাচী পৌঁছাবার জন্য সুদীর্ঘ আকাশযাত্রায় বেরুবার কয়েক মিনিট আগে প্রত্যেকটি বিমানের পেছেনের দরজার কাছে এসে দাঁড়ায় একটি সামরিক এ্যাম্বুলেন্স গাড়ি এবং দ্রুত, এমন কি গোপনীভাবেও বিমানের ভিতর তোলা হয়।

রোগীরা হচ্ছেন সৈনিক, তারা পশ্চিম পাকিস্তানে যাচ্ছেন, কারণ ঢাকা সামরিক হাসপাতালগুলি ইতিমধ্যেই ভরে গেছে। ... পিআইএর বিমানগুলির চারভাগের এক ভাগই আহত সৈনিকে ভর্তি থাকে।[৪০]

এই সংকট ঢাকাবাসীর কাছ থেকে আড়াল করেই আহত সেনাদের পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠায় সামরিক বাহিনী। কারণ বিমানবন্দরের কাছাকাছি কোন বাঙালিকে আসতে দেওয়া হত না। মুরে সেল জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে যখন বিমানে যাচ্ছিলেন, তখন ঐ বিমানে আহত ৬ জন সৈনিককে দেখতে পান। আহতদের মধ্যে দুইজনের পা মুক্তিবাহিনীর মাইন বিস্ফোরণে উড়ে গেছে। বাকি ৪ জন গুলিবিদ্ধ।[৪১]

দখলদার বাহিনীর এই বিপর্যয়ের আরও মারাত্মক প্রভাব ছিল, নিহত সেনাদের লাশ পাকিস্তানের পাঠাতে ব্যর্থতা। বিশেষ করে জুলাই-আগস্টে পাকিস্তানি সেনার নিহতের সংখ্য বেড়ে যাওয়ায় এই সংকট আরও প্রকট হয়ে উঠে। এতে বাংলাদেশের বিভিন্ন রণাঙ্গনে যুদ্ধে লিপ্ত সেনা সদস্যদের মনোবল ঠেকে তলানীতে। গুলিবিদ্ধ ও মুমূর্ষু সহযোদ্ধা ঘটনাস্থলে লম্বা সময় পড়ে থাকা এবং বর্ষাকালে সৈন্য মৃত্যুর হার বেড়ে যাওয়ার কারণে, সৈনিক ও অফিসারদের মনোবলে ধস নামে। এর স্বীকারোক্তি পাওয়া যায় যুদ্ধকালীন লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খান ও পরে লেফটেন্যান্ট জেনারেল এ কে নিয়াজীর পাবলিক রিলেসন অফিসার সিদ্দিক সালিকের বয়ানে। বহুল আলোচিত *Witness to Surrender* গ্রন্থে সিদ্দিক সালিক লিখেন—

… Their plight cannot measuredin terms of casualities alone. The deeper damage was in psychological field. What affected the morale of the troops most was the fect that neither could the wounded allways be evacuated to military hospitals for treatment nor the dead be flown to West Pakistan. … As to the dead, we flew them to West Pakistan initially, but when by July and August their numbers began to soar, we stop sending them to their relatives for fear of 'creating an unnecessary scare'.[৪২]

সিদ্দিক সালিকের বই থেকে আরও জানা যায়, বাংলাদেশে মুক্তিবাহিনীর হামলায় নিহত সেনার লাশ পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যেতে স্বজনদের অব্যাহত চাপ ছিল। সেনাদের পরিবারের পক্ষ থেকে প্রিয়জনকে জীবিত অথবা নিহত হয়ে থাকলে তার লাশ ফেরৎ চেয়ে সামরিক শীর্ষ অফিসারদের কাছে চিঠিও লেখা হয়। কিন্তু লাশ পাঠানো হচ্ছিল না। লাশ পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠানো বন্ধ রাখার সিদ্ধান্তের বিষয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর চিফ অব স্টাফ

জেনারেল আবদুল হামিদ খানের মতামত চাওয়া হয়। 'নিহত সেনারা পূর্বপাকিস্তান যেমন মূল্যহীন, পশ্চিম পাকিস্তানেও তাই' জবাবে এমন নিষ্ঠুর ও অমানবিক মন্তব্য করেছিলেন জেনারেল হামিদ খান।

বর্ষা-বৃষ্টিতে শরণার্থীদের দুর্ভোগ ও ঘুরে দাঁড়ানো

বর্ষাকালে বিপাকে পড়ে ভারতে আশ্রয় নেয় শরণার্থীরা। অনেক শরণার্থী তাঁবু ও ছোট ঘর পানিতে ডুবে যায়। নানা রোগব্যধিতে আক্রান্ত হয়ে মারা যান অনেকে, বিশেষ করে শিশু ও বৃদ্ধরা। মৌসুমী বৃষ্টির কারণে শরণার্থীরা যে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সম্মুখীন হবে—এ নিয়ে অবশ্য আলোচনা হয় জুন মাসেই। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের প্রতিবেদনেও বিষয়টি উঠে আসে। যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিখ্যাত সাপ্তাহিক *নিউজউইক*-এর প্রতিবেদক টনি ক্লিফটন এক সপ্তাহ ধরে ভারতে আশ্রয় নেওয়া বাঙালি শরণার্থী ক্যাম্প ঘুরে একটি প্রতিবেদন করেন। প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয় একাত্তরের ১৬ জুন। সেখানে আসন্ন বর্ষায় শরণার্থীরা যে দুঃখ-দুর্দশায় পড়বে, তা উঠে আসে। প্রতিবেদনটিতে টনি ক্লিফটন উল্লেখ করেন—

ভারী কালোমেঘে ঢেকে আছে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের আকাশ। আসন্ন বর্ষা মৌসুমের পূর্বাভাস। যে কোন সময় বর্ষণ শুরু হতে পারে। আর বৃষ্টিপাত সবসময় ধ্বংস বয়ে আনে। ভয়-ভীতি-ত্রাস এবং দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে চল্লিশ লাখ পাকিস্তানি নিজ সীমান্তবর্তী এলাকায় জীর্ণশীর্ণ শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন, এই বিপর্যয় তাদের দুর্ভোগ নিশ্চিত বাড়িয়ে দিবে। ভারত অলৌকিকভাবে তাদের খাবার ও আশ্রয় ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু তাদের সব প্রচেষ্টা সাধারণ বৃষ্টিপাতেই ধুলিস্যাৎ হয়ে যেতে পারে। ভারী বৃষ্টিপাত হলে তা থেকে সৃষ্ট বন্যা দুর্ভোগ যেকে আনবে যা সর্বনাশা ঘূর্ণিঝড়ের সমতুল্য।[৪৩]

ভারত লাখ লাখ বাঙালি শরণার্থীকে আশ্রয় দিয়ে বিশাল মানবিকতার পরিচয় দেয়। দেশটির তরফ থেকে শরণার্থীদের থাকা ও খাদ্যের যোগানে সর্বাত্মক চেষ্টাও করা হয়। বর্ষার ঢল ও বৃষ্টিতে ডুবে যাওয়া ক্যাম্পগুলোতে থাকা শরণার্থীদের জন্য আবার নতুন করে অস্থায়ী বাসস্থান তৈরি এবং তাদের খাদ্যের ব্যবস্থা ও তা পৌঁছানো সহজ ছিল না। পশ্চিবঙ্গের ২৪ পরগনা জেলার বনগাঁ মহকুমায় সীমান্তবর্তী শরণার্থী ক্যাম্প বর্ষার পানিতে ডুবে যায়। চারদিকে পানি আর পানি। শরণার্থীরা তখন উঁচু মাচা তৈরি করে কোনো রকমভাবে টিকে থাকার চেষ্টা করে। অনেকে স্কুলের ছাদে আশ্রয় নেয়। বর্ষা-বৃষ্টির পানিতে পরিস্থিতিতে এমন হয়েছিল যে, সেখানে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত রেখা চিহ্নিত করা কঠিন হয়ে পড়ে।[৪৪] তৎকালীন অবিভক্ত ২৪ পরগনা জেলার

আলীপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট আলী শূর বনগাঁ এলাকায় শরণার্থীদের ত্রাণকার্জ পরিচালনা করেন। বর্ষায় ডুবে যাওয়া শিবিরের শরাণার্থীরা ত্রাণ পাচ্ছে না, এমন সংবাদ পেয়ে আলী শূর ত্রাণ নিয়ে ছুটে যান। কিন্তু পানিতে মাঠঘাট ডুবে যাওয়ায় ত্রাণ বিতরণ সহজ ছিল না। পরে নৌকা করে ত্রাণ বিতরণ করা হয়। অনেকক্ষেত্রে নৌকা থেকে ছুঁড়ে মেরে ত্রাণের প্যাকেট দিতে হয়েছে বলেও স্মৃতিচারণে উল্লেখ করেছেন আলী শূর। পানিতে সীমান্তরেখা তলিয়ে যাওয়ায় তারা অসাবধানতাবশত বাংলাদেশের ভেতরে ঢুকে পড়েন। তবে মুক্তিযোদ্ধাদের সতর্ক অবস্থান থাকায় সীমান্তের ভেতরেও ত্রাণ বিতরণ করে নিরাপদের ফিরতে সক্ষম হন আলী শূর ও তাঁর সঙ্গীরা।[৪৫]

ভারতের উদ্দেশ্যে যাত্রাপথেও বৃষ্টির কারণে দুর্ভোগে পড়ে অনেক শরণার্থী। জহির রায়হানের বিখ্যাত প্রামাণ্যচিত্র 'স্টপ জেনোসাইডে' দেখা যায়, বর্ষায় বৃষ্টির মধ্যে হাজার হাজার শরণার্থী মাইলের পর মাইল হাঁটছে। বিশেষ করে নারী, শিশু এবং বৃদ্ধদের ভোগান্তি ছিল সীমাহীন। মুক্তিযুদ্ধকালীন দেশি-বিদেশি সাংবাদিকদের তোলা ছবিতেও এমন চিত্র দেখা যায়।

তবে দখলদার বাহিনীর হাত থেকে মুক্তির নেশায় পাগল বাঙালি এই বর্ষাকালীন কষ্টও মেনে নিয়েছিল। কারণ তাদের মূল আকাঙ্খা ছিল স্বাধীনতা। তাই বর্ষাকালীন এই বিশাল সংকটে নিজেদেরকে দ্রুত মানিয়ে নিতে সক্ষম হন তারা, বিশেষ করে মনোবলের দিক থেকে। বাঙালিদের এই ধৈর্য্য ও ত্যাগের বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে নিউজউইকে তুলে ধরে টনি ক্লিফটন বলেন—

বাঙালিরা এই দুঃখ-দুর্দশা সহ্য করতে ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছে। তাদের মধ্যে এসব নিয়ে তেমন অভিযোগ শোনা যায়নি। বর্তমানে ভারতে বর্ষাকাল।... এখানে আস্তে আস্তে দীর্ঘ সময় ধরে বৃষ্টিপাত হয়। ফলে কাদা সৃষ্টি হয় এবং পর্যাপ্ত পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা না থাকায় বন্যা হয়। কিন্তু শরণার্থীরা এখানে শান্তভাবেই অবস্থান করছে। এ পরিস্থিতিতেই অনেকে তাদের জীবনের গল্প শোনাতে যান, যাতে আমি অন্যদেরকে বলতে পারি।[৪৬]

মূল্যায়ন

মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে অল্পসময়ে বাঙালিদের ঠান্ডা করে দেওয়ার দখলদার পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর যে পরিকল্পনা ছিল তা শুরুতেই বাধাপ্রাপ্ত হয়। কারণ ২৫ মার্চ রাতে আক্রমণের শুরুতেই ঢাকার পিলখানা ও রাজারবাগ পুলিশ হেডকোয়ার্টারসহ বিভিন্ন জায়গায় তারা বাঙালিদের দ্বারা তীব্র প্রতিরোধের মুখোমুখি হয়ে হয়েছিল। প্রথমে ভারী অস্ত্রের মুখে টিকতে না পারলেও সময় যত গড়ায় ততই বাঙালিদের প্রতিরোধের সক্ষমতা বাড়ে। ভারতে গিয়ে

ছাত্রযুবাদের প্রশিক্ষণ পরবর্তী পাকিস্তানিদের উপর গেরিলা আক্রমণ চলতে থাকে। আসতে থাকে সফলতা। এই আক্রমণ তীব্রতর হয় বর্ষাকালে।

বর্ষাকালে মুক্তিবাহিনীর সফলতা ও পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর ব্যর্থতার মূল্যায়নের চিত্রকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়—

(এক) পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বর্ষার আগেই এপ্রিল-মে মাসে বাংলার গ্রামাঞ্চলেও তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার সর্বাত্মক চেষ্টা করে। বর্ষাকালকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে নদীতে যুদ্ধের জন্য সেনা ও রাজাকার প্রশিক্ষণ এবং বিশেষ গাটবোট তৈরি করা হয়। তারা শুষ্ক এলাকা থেকে এসেছে যেমন সত্য, তেমনি জলের যুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য সর্বাত্মক প্রস্তুতি নেওয়া হয়, এটিও সত্য। সরকারি সূত্রে প্রকাশিত সমকালীন সংবাদপত্রে প্রতিবেদনে যার দালিলিক তথ্য পাওয়া যায়। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বর্ষাকালীন প্রস্তুতি নিয়ে খুবই আত্মবিশ্বাসী ছিল। 'বর্ষা মৌসুমের জন্য সেনাবাহিনী সম্পূর্ণ প্রস্তুত' এমন ভাষায় প্রচারিত খবর পরিবেশন থেকে বুঝা যায়, এই প্রস্তুতি নিয়ে তাদের শুধু আত্মবিশ্বাসই নয়, দম্ভও তৈরি হয়েছিল। কিন্তু জলের রাজা বাঙালি মুক্তিফৌজের আক্রমণে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সব প্রচেষ্টা ও আত্মবিশ্বাস ভেস্তে যায়। নদীতে অধিকাংশ যুদ্ধেই পাকিস্তানি সেনা ব্যাপক বিপর্যস্ত হয়। পরে পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসা বাঙালি সেনা ও অফিসাররা যুক্ত হন মুক্তিবাহিনীতে। ফলে পেশাদার সেনার শাণিত অভিজ্ঞতার সংস্পর্শ ও সমন্বয়ে ছাত্রযুবাদের সম্মুখযুদ্ধে অংশ নেওয়ার আকাঙ্খা দুর্দমনীয় হয়ে উঠে। বর্ষাকালে-এর তীব্রতা বাড়ে।

(দুই) বাংলাদেশে বিভিন্ন জায়গায় গেরিলা আক্রমণে পাকিস্তানি সৈন্য প্রতিনিয়ত মরতে থাকায় তাদের সেনা সংখ্যা কমতে থাকে। পরাজিত সৈন্যর অস্ত্র ও গানবোট মুক্তিবাহিনীর হস্তগত হতে থাকায় কমছিল তাদের অস্ত্রভাণ্ডারও। এই বাস্তবতায় বর্ষার পানির যুদ্ধে বিরাট সংকটের মুখোমুখি হয় পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী। ভারতের ত্রিপুরার আগরতলা থেকে প্রকাশিত ৮ আগস্ট ১৯৭১, *দৈনিক সংবাদ* পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনে দেখা যায়, জলের আক্রমণে বিপর্যস্ত পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী জলযানের তীব্র সংকটে পড়ে। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক স্পিডবোট ও গানবোট হারিয়ে এই সংকট মোকাবেলায় তারা বিদেশি রাষ্ট্রে কাছে জলযান চেয়ে সাহায্য কামনা করে। বাংলাদেশ সরকারের পূর্বাঞ্চলীয় জনসংযোগ ও তথ্যকেন্দ্রের সূত্রে প্রতিবেদনটিতে আরও বলা হয়—

অধিকৃত বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে অনুপ্রবেশ করার জন্য পাক হানাদাররা কিছু নৌযান ভাড়া করার জন্য বিভিন্ন বৈদেশিক রাষ্ট্রের কাছে জোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। পঃ পাক সমর সচিব মিঃ গিয়াসুদ্দীন আহমেদ ইতোমধ্যেই

গানবোট সংগ্রহের জন্য কানাডা ও হল্যান্ডে জোর চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু সফল হননি।[৪৭]

তবে পাকিস্তানি সামরিক দপ্তর কর্তৃক বিদেশি রাষ্ট্রের কাছে গানবোটের এই সহায়তা কামনা করা হয় বাস্তবতা ও প্রকৃত উদ্দেশ্য আড়াল করে। জলের যুদ্ধে বিধ্বস্ত পরিস্থিতির কারণে সৃষ্ট সংকটের কথা ঢেকে, ত্রাণ সামগ্রী পরিবহনের নাম করে হল্যান্ড ও কানাডার কাছে এসব নৌযান চাওয়া হয়।[৪৮]

(তিন) এই বাস্তবতায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আরেকটি বড় সংকটের মুখোমুখি হয়। সেটি হলো 'মানসিক মনোবল ধস'। যাকে সিদ্দিক সালিকের লেখা *Witness to Surrender* গ্রন্থে The deeper damage was in psychological field. বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এরফলে পাকিস্তানি সেনারা যুদ্ধের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।

(চার) বাংলাদেশের দখলদার পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর যখন এই বিপর্যস্ত পরিস্থিতি তখন ৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭১, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন। ঘোষণায় বলা হয়, ১ মার্চ হতে ৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত যারা অপরাধ করেন অথবা যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে, প্রেসিডেন্ট জেনারেল এ. এম. ইয়াহিয়া খান তাদের সবাইকে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন। সশস্ত্র বাহিনী, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস (ইপিআর), পুলিশ ও আনসার বাহিনী ক্ষেত্রেও এই সাধারণ ক্ষমা প্রয়োজ্য হবে।[৪৯] কিন্তু মুক্তিযোদ্ধা, ভারতে আশ্রিত শরণার্থী এবং অবরুদ্ধ বাংলাদেশে অবস্থানরত বাঙালিদের মধ্যে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার এই ঘোষণা কোনো রকম আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারেনি। এর কারণ প্রথমত, জুন-জুলাই ও আগস্টে মুক্তিবাহিনী আক্রমণের সাফল্য ও পাকিস্তানি বাহিনী পর্যদস্ত অবস্থা দেখে বাঙালিদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস তৈরি হয়ে যায় যে, মুক্তিবাহিনীর বিজয় আসন্ন। দ্বিতীয়ত, যুদ্ধকে থামিয়ে দিতে ইয়াহিয়া ফাঁদের উদ্দেশ্য বাঙালিদের বুঝতে কোনো অসুবিধা হয়নি। অপরদিকে, শরণার্থীরা পাকিস্তানি শাসন কাঠামোর মধ্যে ফিরে যেতে কোনোভাবেই রাজি ছিল না।

উপসংহার

১৯৭১ সালে বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ ছিল ন্যায়ের যুদ্ধ। অপরদিকে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী লিপ্ত ছিল অন্যায় যুদ্ধে। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিরাট ব্যবধানের বিজয়ে, বাঙালির স্বাধীকারের পক্ষে গণরায় ও আইনিভিত্তি তৈরি হয়ে যায়। কিন্তু বাঙালিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের ইচ্ছা পাকিস্তানিদের কখনই ছিল না। তাই একটি পেশাদার সেনাবাহিনী অধিকার চাওয়া বাঙালির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, চালিয়েছিল নির্মম ও নৃশংস গণহত্যা। মুক্তিকামী বাঙালি এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। বাঙালিদের শেষ করে দিতে পাকিস্তানি বাহিনীর যে পরিকল্পনা ছিল— সময় যত গড়ায়, মুক্তিবাহিনীর ধারাবাহিক প্রতিরোধ যুদ্ধে সেটি ব্যর্থ হতে থাকে। দেশকে দখলদার বাহিনী থেকে মুক্ত করতে প্রাণপণ লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয় বাঙালিরা। এর গতি বাড়ে একাত্তরের বর্ষাকালে। দখলদার বাহিনীর জন্য দুর্বলতর সময় ছিল বর্ষাকাল, যদিও তারা পর্যাপ্ত প্রস্তুতিও নিয়েছিল। বর্ষার জল ও কাদার সঙ্গে খাপ খাইয়ে বেড়ে ওঠা মুক্তিবাহিনীর জন্য এই মৌসুম ছিল খুবই সহায়ক। তাই বর্ষাকালীন আক্রমণে পাকিস্তানি বাহিনীর অনেক ক্ষয়ক্ষতি করতে সক্ষম হয় মুক্তিবাহিনী। এ সময় পাকিস্তানি সেনাদের নিহত ও আহতের সংখ্যা অনেক বেড়ে যাওয়ায় তাদের মনোবল ভেঙ্গে পড়ে। অপরদিকে, মুক্তিবাহিনীর মনোবল ছিল দুর্দমনীয় এবং স্বাধীনতার আকাঙ্খায় অগ্নিরূপী।

জুলাই-অক্টোবর পর্যন্ত গেরিলা আক্রমণে পাকিস্তানি আর্মি যখন বিপর্যস্ত এবং একেবারে হাঁফিয়ে ওঠা অবস্থা তখন বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর সদর দপ্তর থেকে দেশি-বিদেশি সাংবাদিকদের কাছে যুদ্ধের সফলতা তুলে ধরা হয়। ১৬ অক্টোবর ১৯৭১, মুক্তিবাহিনীর সদর দপ্তরের পক্ষে একজন মুখপাত্র জানান, মুক্তিবাহিনীর পূর্ণ ও স্বল্প প্রশিক্ষিত মুক্তিযোদ্ধারা এখন ভীষণ মারমুখী। প্রতিটি সেক্টরেই মুক্তিবাহিনী সক্রিয়, তাদের কাছে হারছে পাকিস্তানিরা। এই ব্রিফিংয়ে চমকপ্রদ বড় দুটি খবর ছিল। একটি হলো, বঙ্গবন্ধুর নামে মুক্তিবাহিনীর নিজস্ব নৌবহর সংগঠিত হওয়ার খবর। জলের যুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনীর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া পাঁচটি মোটরবোট দিয়ে, আপাতত এই নৌবহর প্রস্তুত করা হয়েছে বলে জানানো হয়। অপর খবরটি ছিল, মুক্তিবাহিনীর বিমান ইউনিট গঠন।[৫০]

অক্টোবরের শেষ দিক ও নভেম্বরে এসে মুক্তিবাহিনীর আক্রমণের গতি আরও বাড়ে। লন্ডন থেকে প্রকাশিত *সানডে টাইমস* পত্রিকায় ১ নভেম্বর প্রকাশিত প্রতিবেদনে জানানো হয়, মুক্তিবাহিনীর অভিযানে কোণঠাসা হয়ে পড়েছে পাকিস্তানি সেনারা।[৫১] এরপর ১৯৭১ সালের ২১ নভেম্বর বাংলাদেশের সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী সম্মিলিতভাবে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে আক্রমণ সূচনা করে। পরে ৩ ডিসেম্বর রাতে বাংলাদেশ-ভারতের যৌথবাহিনীর আক্রমণে সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু হলে দখলদার পাকিস্তানি বাহিনী তেমন কোনো প্রতিরোধই গড়তে পারেনি। ১৬ ডিসেম্বর আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয় তারা। বিশ্বে মানচিত্রে আত্মপ্রকাশ করে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ।

তথ্য নির্দেশ

১. সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.) *বাংলাপিডিয়া, ৮ম খণ্ড*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, *ঢাকা*, ২০১১, পৃ. ৪০৬।

২. ওয়াকিল আহমদ, *বাংলায় বিদেশি পর্যটক*, গ্লোব লাইব্রেরি প্রাইভেট লিমিটেড, ঢাকা, ২০০০ পৃ. ২২।

৩. শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ৫৬।

৪. মাহবুব আলম, *গেরিলা থেকে সম্মুখ যুদ্ধে, দ্বিতীয় খণ্ড*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৯৩।

৫. সালাহউদ্দীন আহমদ এবং অন্যান্য (সম্পা.) *একাত্তরের চিঠি*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ২৬।

৬. সিডনি শনবার্গ, *ডেটলাইন বাংলাদেশ : নাইন্টিন সেভেন্টিওয়ান* (মফিদুল হক অনুদিত), সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, পৃ. ৩৫।

৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ঐ।

৮. কম্যান্ডো মো. খলিলুর রহমান (সম্পা.) *মুক্তিযুদ্ধ নৌ-কম্যান্ডো ও নাবিকদের জীবনকোষ*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ৮—১০।

৯. আশফাক হোসেন, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও ইন্দিরা গান্ধী*, সুবর্ণ প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ২২।

১০. লে. জেনারেল এফ জ্যাকব, *স্যারেন্ডার অ্যাট ঢাকা*, আনিসুর রহমান (অনূদিত), ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ১৫৭।

১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮—৫৯।

১২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১।

১৩. শুভজ্যোতি ঘোষ, 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে কী ছিল ভারতীয় সেনার সামরিক কৌশল?', *বিবিসি বাংলা*, ১৫ ডিসেম্বর ২০১৬।

১৪. প্রাগুক্ত।

১৫. দ্রষ্টব্য : সাহাবউদ্দীন আহমেদ, বীর উত্তম, মতিউর রহমান (সম্পা.), 'মুক্তিযুদ্ধে বিমানবাহিনী এবং আমার অভিযান', *সম্মুখযুদ্ধ ১৯৭১: মুক্তিযোদ্ধাদের কলমে*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০২০, পৃ. ২০২—২০৫।

১৬. দ্রষ্টব্য : নজরুল ইসলাম, *একাত্তরের রণাঙ্গন—অকথিত কিছু কথা*, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ৪৯। মুক্তিবাহিনীর জনসংযোগ কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্বপালন করেন।

১৭. দ্রষ্টব্য : ইমাম-উজ জামান বীর বিক্রম, 'বিলোনিয়ার যুদ্ধ, সম্মুখযুদ্ধ ১৯৭১', মতিউর রহমান (সম্পা.) *মুক্তিযোদ্ধাদের কলমে*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, পৃ. ১৯০—১৯৭।

১৮. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৫ জুন ১৯৭১।

১৯. *আজাদ*, ২৫ জুন ১৯৭১।

২০. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৬ জুন ১৯৭১।

২১. সরদার ফজলুল করিম, *একুশ একাত্তর ও বঙ্গবন্ধু*, শেখ রাসেল (সংকলক), বিপ্লবীদের কথা প্রকাশনা, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ১৩৭।

২২. যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা মেজর (অব.) এম. ওয়াদুদ। মুঠোফোনে সাক্ষাৎকার গ্রহণ, ১০ আগস্ট ২০২১।

২৩. মুক্তিযোদ্ধা দেলোয়ার হোসেন মজুমদারের সাক্ষাৎকার গ্রহণ : ২৭ অক্টোবর ২০২১।

২৪. রেহমান সোবহান, *উতল রোমন্থন: পূর্ণতার সেই বছরগুলো*, সেজ পাবলিশিং, ভারত, ২০১৮, পৃ. ৩৪।

২৫. খালেদ মোশাররফ, *মুক্তিযুদ্ধে ২ নম্বর সেক্টর এবং কে ফোর্স*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ৯০—৯১।

২৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯১।

২৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৯—৯০।

২৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ঐ।

২৯. মুনতাসীর মামুন সম্পাদিত, *গণমাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, দ্বাবিংশ খণ্ড*, অনন্যা, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ২৬।

৩০. বাশার খান, কচুরিপানা ১৯৭১ : মুক্তিযুদ্ধের সহায়ক অনুষঙ্গ, মতিউর রহমান (সম্পা.), *প্রতিচিন্তা*, সংখ্যাঃ জানুয়ারি-মার্চ ২০১৯, পৃ. ৯৯।

৩১. *প্রথম আলো*, ১৮ আগস্ট ২০২১।

৩২. http://www.mymensingh.gov.bd/|

৩৩. *দৈনিক সংবাদ*, ২০ আগস্ট ১৯৭১, ত্রিপুরা।

৩৪. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৬ আগস্ট ১৯৭১।

৩৫. আবু জাফর শামসুদ্দীন, *আত্মস্মৃতি*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ৫৬৬।

৩৬. শাহজাহান সিদ্দিকী বীর বিক্রম, সাক্ষাৎকার গ্রহণ : ৭ অক্টোবর ২০১৫।

৩৭. *প্রথম আলো*, ৩০ ডিসেম্বর ২০১৬।

৩৮. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৭ আগস্ট ১৯৭১।

৩৯. শাহজাহান কবির বীরপ্রতীক, *নৌ-যুদ্ধ একাত্তর*, পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০২০, পৃ. ২৯৬।

৪০. সুকুমার বিশ্বাস (সম্পা.) *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে আগরতলা, ত্রিপুরাঃ দলিলপত্র*, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ৪৮৮।

৪১. *প্রাগুক্ত*।

৪২. Siddiq Salik, *Witness To Surrender*, The University Press Limited (1st Published 1977 By Oxford University Press), Dhaka, 3rd Impression, P. 106. পাকিস্তান আর্মির তৎকালীন মেজর সিদ্দিক সালিক পরে পাকিস্তান আর্মির ব্রিগেডিয়ার এবং পাকিস্তানের আরেক সামরিক শাসক জেনারেল জিয়াউল হকের প্রেস সেক্রেটারি, ১৯৮৮ সালের ১৭ আগস্ট প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের সঙ্গে এক সফরে বিশেষ সামরিক বিমান বিধ্বস্ত হয়ে নিহত।

৪৩. হাসান শাহরিয়ার, *নিউজউইক-এ বাংলাদেশ*, উৎস প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৯, পৃ. ৪৮।

৪৪. অংশু শূর, *কলকাতার বুদ্ধিজীবিদের দৃষ্টিতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, অমর সাহা (সম্পা.), আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ১৩৮। অংশু শূর ১৯৭১ সালে অবিভক্ত ২৪ পরগনা জেলার আলীপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তিনি বনগাঁ এলাকায় শরণার্থীদের ত্রাণকার্জ পরিচালনা করেন।

৪৫. *প্রাগুক্ত*।

৪৬. হাসান শাহরিয়ার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৯।

৪৭. সুকুমার বিশ্বাস (সম্পা.) *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৯১।

৪৮. *প্রাগুক্ত*।

৪৯. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭১।

৫০. *প্রথম আলো*, ১৬ অক্টোবর ২০২১।

৫১. *প্রথম আলো*, ১ নভেম্বর ২০২১।